বিশাখা

কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে
প্রতিভা বসু কর্তৃক প্রকাশিত

প্রচ্ছদশিল্পী : সৌরেন সেন

রচনাকাল ১৯৪৫
প্রথম প্রকাশ
৩ শ্রাবণ ১৩৫৩
১৯ জুলাই ১৯৪৬

আড়াই টাকা

কলকাতা ১৮, বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট, দি ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ড্রি এণ্ড
ওরিএন্টাল প্রিন্টিং ওআর্কস লিঃ, থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, বি-এসসি কর্তৃক মুদ্রিত

বুদ্ধদেব বসু



কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু
প্রণীত

কবিতাভবন
প্রকাশিত

বিশাখা

কঙ্কাবতী

সমুদ্রতীর

নতুন পাতা

এক পয়সায় একটি

সব-পেয়েছির দেশে

২২শে শ্রাবণ

মায়া-মালঞ্চ

হাওয়া-বদল

রূপান্তর

বিদেশিনী

দময়ন্তী

উত্তরতিরিশ

কালের পুতুল

গল্পসংকলন

একটি কি দুটি পাখি

একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা

লেখকের গ্রন্থপঞ্জী ও কবিতাভবনের সম্পূর্ণ তালিকা একসঙ্গে পুস্তিকাকারে
প্রকাশিত হয়েছে

বিশাখা

আমাদের শহুরে সমাজে ছেলেমেয়েদের বিয়ের ভাবনা মা-বাবাদের আর ভাবতে হয় না আজকাল, সে-ভার তারা নিজেরাই নিয়েছে। এ-ব্যবস্থা ভালোই। যে-সব মা-বাবা এটা মেনে নিতে পারেন না, বাধা দিতে গিয়ে খামকা একটা গোলযোগ পাকিয়ে তোলেন, তাঁরা সুবুদ্ধির চাইতে অধিকারবোধের পরিচয় দেন বেশি।

ছেলেমেয়েরা নিজেরা যখন বিয়ে করে তাকে আমরা বলি প্রেমে-পড়া বিয়ে। এই প্রেমে পড়া ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনেক মা-বাবার মনে একটা নিদারুণ ত্রাস আছে—এখনো আছে। কেন, কে জানে। তাঁরাও তো প্রেমে পড়েছেন, যদিও বিয়ের আগে নয়, পরে। বিয়ের আগে প্রেমে পড়বার সুযোগই তাঁরা পেতেন না, এত অল্প বয়সে তাঁদের বিয়ে হ'তো। অবশ্য বিয়ের পরে, বেশ কিছুদিন পরে, অন্য-কোনো পুরুষ বা নারীর প্রতি তাঁরা যে মনে-মনে কখনোই মধুর হননি, তা কি কেউ জোর ক'রে বলতে পারে? কিন্তু সে-কথা মুখে কেউ স্বীকার করবে না, ম'রে গেলেও না।

নিজেরা যাঁরা প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছেন তাঁদের

ছেলেমেয়েদের এখনো বোধহয় বিয়ের বয়স হয়নি। তা যখন হবে তখন এ-ব্যাপারটি নিয়ে এত হাঙ্গামা হয়তো হবে না। নাকি তখনো হবে? দুই পুরুষের মাঝখানে কালের ঢেউ যে-খাল কেটে দেয়, তার উপর সাঁকো তোলা সত্যি কি অসম্ভব?

তাই যদি হয় তাহ'লে, নিজেরা যাঁরা প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেননি, তাঁদের আর দোষ কী। তাঁদের অনেকেরই ধারণা যে প্রেমে-পড়া বিয়ে কখনো সুখের হয় না। হৃদয়রঞ্জন গুপ্তর মনে এ-ধারণা তো বদ্ধমূল। গুপ্ত-সাহেব (সকলে তাঁকে তা-ই ব'লে জানে) জীবনে কখনো প্রেমে পড়েননি। না বাল্যে, না কৈশোরে, না যৌবনে, না প্রৌঢ়ত্বে। না কোনো মেয়ের সঙ্গে, না কোনো পুরুষের সঙ্গে, না কোনো বই বা ছবি বা সুর বা ভাবের সঙ্গে। দেশে না, বিদেশে না। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তো নয়ই, পরস্ত্রীর সঙ্গেও না। এম. এ. পাশ ক'রে বিয়ে করেছেন, বিয়ে ক'রে বিলেতে গিয়েছেন, বিলেতে গিয়ে আরো কতগুলো পাশ করেছেন, ফিরে এসেই চাকরি নিয়েছেন কলকাতার করপোরেশনে, লাফিয়ে-লাফিয়ে উন্নতি করতে-করতে আজ একটি আড়াই হাজারি গদিতে তিনি সমাসীন। মস্ত তাঁর বাড়ি, তিনখানা গাড়ি, তাঁর কথায় হাজার লোক ওঠে বসে। জীবনের এ-রকম ঋজু, মসৃণ নিঃসংশয় গতি মনুষ্যসমাজে দুর্লভ বইকি।

গুপ্তর চার ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে বড়ো। তিনি যখন

বিলেত যান তখন তার জন্মের সূচনা, ফিরে এসে দু'বছরের মেয়ে কোলে নিলেন। যুবা বয়স থেকেই গুপ্তর নীরন্ধ্র দায়িত্বজ্ঞান, তখন থেকেই মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ভাবছেন। কালক্রমে যখন দেখা গেলো যে খুব সম্ভব এ-ই তাঁর একমাত্র কন্যা, তখন ভাবনা আরো গভীর হ'লো। মেয়েকে কী ভাবে তৈরি করবেন তিনি, কেমন ক'রে জীবনের জন্য প্রস্তুত করবেন? সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মেয়েকে প্রেমে পড়ার ব্যামো থেকে বাঁচাতে হবে। এইরকম সাধু সংকল্পের প্রেরণায় এখনকার দিনেও অনেকে যৌবনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়েকে পরিণয়ের পরপারে নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়ে দেন। যেন বিয়েটাই এ-রোগের চরম চিকিৎসা! যেন দেহের দাবি মিটলেই প্রেমের বীজ ম'রে যায়! বিয়ে হ'লো, ছেলেপুলে হ'লো, ঘরসংসার হ'লো, তারপর যদি মেয়ে অন্য কারো প্রেমে পড়ে? তখন উপায়?

এ-কথা তাঁরা অবশ্যি মনেও আনতে পারেন না। গুপ্ত-সাহেবও পারেননি। তিনিও একবার ভেবেছিলেন চোদ্দ বছরেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। তা যে দেননি তার একটা কারণ এই যে আজকালকার দিনে কেউ তা করে না। কেউ বলতে অবশ্যি তাঁর বন্ধুবান্ধব চেনা-শোনার মহলই বোঝায়। কেউ যা করে না সেটা করতে হ'লে গুপ্ত-সাহেবের মাথা হেঁট হয়, সকলে যা করে সেটা না-করলে তাঁর মাথা কাটা যায়।

এ ছাড়াও আরো একটা কারণ ছিলো। সেটাই আসল। চৌরঙ্গি-ঘেঁষা সর্কুলর রোডে নিজের বাড়ি হবার আগে তিনি যখন শেয়ালদা-ঘেঁষা সর্কুলর রোডে পৈতৃক বাড়িতে থাকতেন, তখন তাঁর এক প্রতিবেশীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সে পরিচয় থেকে ক্রমে দু'পরিবারে রীতিমতো ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে ওঠে। ভদ্রলোক বয়সে হৃদয়রঞ্জনের কিছু বড়ো, নাম অমিয়াংশু দাশ, তখন ডায়মণ্ডহার্বরের এস. ডি. ও.। পড়াশুনোর সুবিধের জন্য পুত্রকন্যাকে, আর পুত্রকন্যার সুবিধের জন্য তাদের মা-কে কলকাতাতেই রেখেছিলেন, নিজে ছুটি-ছাটায় এসে কাটিয়ে যান। তিন ঘণ্টার রাস্তা হ'লেও তিনি খুব ঘন-ঘন আসতে পারতেন না—সরকারি চাকরিতে ও-সব কড়াক্কড়ি তো খুব—একা-একা কর্মস্থলে প'ড়ে থাকতে তাঁর খারাপই লাগতো। তবু এ-কৃচ্ছ্র তিনি বরণ করেছিলেন প্রধানত তাঁর বড়ো ছেলের কথা ভেবে। স্মরজিৎ পড়শুনোয় ভালো, ক্লাশের পরীক্ষায় ফর্স্ট হচ্ছে বরাবর, এখন থেকেই তাকে ভালো ইশকুলে ভালো মাস্টারের তত্ত্বাবধানে রাখা দরকার। বন্ধুকে তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন. তাঁর অনুপস্থিতিতে ছেলের পড়াশুনোর যাতে কোনো ব্যাঘাত না হয়, সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখতে। বলা বাহুল্য, এ-অনুরোধ হৃদয়রঞ্জন আঠারো আনা পালন করেছিলেন। তিনি স্বভাবতই কর্তব্য-পরায়ণ, কর্তব্য-হিশেবে কিছু একটা করতে পারলে আর-কিছু তিনি চান না।

স্মরজিৎকে দেখতে-দেখতে তাঁর খুবই ভালো লাগলো। রং কালো, কিন্তু মুখশ্রী মনোহর, চোখে-মুখে বুদ্ধি জ্বলজ্বল করছে, নিটোল স্বাস্থ্য। যাকে বলে চৌকষ ছেলে। এই বয়সে বুক অব নলেজ আগাগোড়া প'ড়ে ফেলেছে, গড়গড় ক'রে ইংরেজি বলতে পারে, ম্যানার্স জানে, এদিকে উঁচু-লাফে প্রাইজ তার বাঁধা। এ-ছেলে কিছু-একটা না-হ'য়ে যায় না। ভারি চমৎকার একটা কথা হৃদয়রঞ্জনের মনে হ'লো।

একদিন বন্ধুকে তিনি বললেন কথাটা। ঠাট্টার সুরেই বললেন, কিন্তু ঠাট্টার স্তরে বেশিদিন রইলো না। বাবাদের মুখ থেকে মা-দের মুখে উঠলো, মা-দের মুখ থেকে বাবাদের মুখে ফিরে এলো, তারপর দু'বাড়ির সকলেই জেনে গেলো কথাটা, পাত্র-পাত্রী দু'জনও জানলো। স্মরজিতের বয়স তখন এগারো, আর বিশাখার সাত।

অমিয়াংশুবাবুর দিক থেকে আপত্তির কোনো কারণই ছিলো না। হৃদয়রঞ্জনের গায়ে টাকার গন্ধ তিনি পেয়েছিলেন। ছেলের পড়াশুনোর জন্য তিনি যে অকাতরে ব্যয় করছেন ও করবেন, ছেলের শ্বশুরের কাছে তার ডবল উশুল করতে না-পারলে আর হ'লো কী! ভালোই হ'লো, কিছুর জন্যেই চাপ দিতে হবে না, হৃদয়রঞ্জনের সঙ্গে কথা ব'লেই বোঝা যায় যে তাঁর একটিমাত্র মেয়ের সুখের জন্য এমন-কিছু নেই যা তিনি না-করবেন। ফর্দ ধ'রে চাইতে গেলে হয়তো ঠকাই হবে।

আর মেয়েটির স্বাভাবিক রূপলাবণ্য যা-ই হোক, মাজাঘষা শাড়ি-জামার দৌলতে বড়ো হ'লে তাকে ভালোই দেখাবে, সেই সঙ্গে চাল-চলন ইংরেজি উচ্চারণ যে তার রপ্ত হবে সে তো জানাই। স্মরজিতের বৌ হ'য়ে তাকে মানাবে ভালো। একদিন রাত দুটো অবধি অমিয়াংশু আর তাঁর স্ত্রী চুল-চেরা আলোচনা ক'রে দেখলেন যে এর চেয়ে ভালো আর-কিছু হ'তে পারতো না। দু'বাড়ির সকলেরই তা-ই মত। সকলেই খুশি।

সকলের চেয়ে বেশি খুশি হৃদয়রঞ্জন (তখন পর্যন্ত তিনি গুপ্ত-সাহেব হননি)। এ-বিয়ে বিধাতা যেন নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছিলেন—জাতে পর্যন্ত মিলে গেছে। ঘর ভালো, আর্থিক অবস্থা ভালোই, আর ছেলের তো তুলনা হয় না। যেমন মেধাবী, তেমনি স্বাস্থ্যবান ; উৎসাহী, অথচ উচ্ছৃঙ্খল নয়। শাখাকে তিনি যে-আদর্শে যেমন ক'রে গ'ড়ে তুলছেন, স্মরজিৎকে ওর ভালো লাগবে নিশ্চয়ই। খুব ভালো লাগলো, খুব নিশ্চিন্ত হলেন এ-কথা ভেবে যে প্রেমে পড়ার সম্ভাবনাটাকে একেবারে গোড়া সুদ্ধ উপড়ে ফেলা হ'লো। ছেলেবেলা থেকে দু'জনে দু'জনকে সব সময় কাছাকাছি দেখবে ; কাছাকাছি দেখার জন্য ভালোবাসা হবে, অথচ সব সময় দেখার জন্য কোনো অসংযম সম্ভব হবে না ; বড়ো হ'তে-হ'তে এই ধারণা মনের মধ্যে একেবারে গাঁথা হ'য়ে যাবে যে ওরা স্বামী-স্ত্রী, তাই মনে-মনে অন্য-কোনো মানুষকে বসাতেই পারবে না সে-আসনে—ইচ্ছাটা জাগবার

আগে থেকেই ইচ্ছার পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়ে যে হঠাৎ একদিন এসে বলবে, 'বাবা আমি বিমলকে (কি সুরেশকে কি প্রভাতকে) ভালোবাসি, তাকে আমি বিয়ে করবো—' তারপর তা নিয়ে খুনোখুনি করবে, তার আর উপায় রইলো না। বাল্যবিবাহের স্থিতিশীলতার উপর কোর্টশিপের রংটুকু মাখিয়ে দেয়া হ'লো, কাটা পড়লো দুটোরই অনাচার। প্রেমে পড়ার চেহারাটা রইলো, ওরা যদি চায় তা নিয়ে খেলা ক'রে সময় কাটাতে পারে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে এটাকে প্রেমে-পড়া বিয়ে ব'লে চালাতেও পারে—জানতেও পারবে না যে যে-বস্তুর নাম ওরা করছে তার দ্বীপান্তর হ'য়ে গেছে অনেক আগেই। প্রেমে পড়ার এমন একটা চিরস্থায়ী, অব্যর্থ টিকা কে কবে বের করতে পেরেছিলো! নিজের বুদ্ধিতে নিজেই চমৎকৃত হলেন হৃদয়রঞ্জন।

মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল রঙে ফুটে উঠলো তাঁর চোখের সামনে। কোনো হাঙ্গামা নেই, জ্বলুনি-পুড়ুনি নেই ; শান্ত স্থির প্রসন্ন চিত্তে ঠিক সময়ে ঠিক লোকের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেলো। বিয়ের পরে আর ভাবনা কী—কেননা স্মরজিৎ শুধু যে ভালো ছেলে তা তো নয়, অত্যন্ত যোগ্য ছেলেও বটে। ওর বাপের শেষ লক্ষ্য অবশ্যই সিবিল সর্বিস পরীক্ষা—আর ওর রকম-সকম এখনই যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় আই. সি. এস. না-হ'য়ে ও ছাড়বেই না।

স্মরজিতের বাড়ির লোকেরাও ধ'রেই নিয়েছিলো যে সে আই. সি. এস. হবে। তার দুই কুল তিন পুরুষ সরকারি চাকুরে। পিতামহ ছিলেন পব্লিক প্রসিকিউটর, মাতামহ দিল্লি-শিমলার মহিমান্বিত কেরানিকুলের একজন। কাকারা মামারা কেউ মুন্সেফ, কেউ ট্যাক্সো-অফিসার, কেউ বা ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়র, কেউ বা সিবিল সর্জন। এমনকি, তার তিন মেশো আর চার পিশে সকলেই কোনো-না-কোনো ডিপার্টমেন্ট আলো করেছিলেন কিংবা ক'রে আছেন—কেউ পুলিশে, কেউ পোস্টাপিশে, কেউ কৃষিতে, কেউ বাণিজ্যে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রায় সাহেব রায় বাহাদুরের ছড়াছড়ি। কোনো পারিবারিক বিবাহ উপলক্ষ্যে সবাই যখন একত্র হন, বাইরের লোকের মনে হয় যে সমস্ত ব্রিটিশ গবর্মেন্ট ঘরে-ঘরে গমগম করছে। খেতাব-খচিত পেনশন-পোষিত রাজসেবার এই রাজপথ কোনো-একদিন আই. সি. এস.-এর কৈলাসধামে গিয়ে পৌঁছবে, মনে-মনে সকলেরই এই আশা। এঁদের মধ্যে চেষ্টা ক'রে বিফল হয়েছেন অনেকেই। সকলের সেই সম্মিলিত উচ্চ আশা স্মরজিতের মধ্যে যেন রূপ নিলো। এতদিন ধ'রে এত লোকের আজীবন প্রভু-ভক্তির পরম অভিব্যক্তি এ-ছেলের মধ্যে দেখা যদি না দেয়, সেটা অন্যায়, সেটা ভাগ্যের বঞ্চনা।

ছেলেবয়েস থেকেই স্মরজিৎ জেনে আসছে যে তাকে আই. সি. এস. হ'তে হবে। প্রস্তুত হচ্ছে ছেলেবেলা থেকেই।

নানা বিষয়ে পড়াশুনো করছে, সেই সঙ্গে ব্যায়ামচর্চা। পনেরো বছর বয়সেই তার চাল-চলন রাশভারি হ'য়ে উঠলো, সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলে, প্রতিবাদ করে, গুরুজনদের ইংরেজির ভুল শুধরে দেয়। সে যে আই. সি. এস. হবার জন্যই ধরাধামে এসেছে সে-বিষয়ে তার নিজের মনে আর সন্দেহ নেই, অন্যদেরও বুঝিয়ে দেয় সুযোগ পেলেই। কুড়ি টাকা স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে সে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকলো তখন তার ভাবখানা এমন হ'লো যেন সে আই. সি. এস. হ'য়েই গেছে। ক্লাশের মধ্যে নানারকম কুতর্কের অবতারণা ক'রে প্রোফেসরদের নাজেহাল করতে দারুণ ফুর্তি লাগে তার—বেশির ভাগ প্রোফেসরকে মানুষের মধ্যে গণ্যই করে না, আর সহপাঠীদের যে চোখে ছাখে তা না-বলাই ভালো। কোন প্রোফেসরের কত মাইনে, কোন দরের চাকরি, সে-সব খবর তার মুখস্থ; শুধু তাদের সঙ্গেই সে বিনীতভাবে কথা বলে, যাঁদের খাশ ইম্পীরিয়ল কি নিদেনপক্ষে সুপীরিয়র সর্বিস। যত রাজ্যের খুচরো খবরের এঁটোকাঁটা কুড়োনোই তার পেশা (আই. সি. এস.-এ ও-ধরনের 'বিদ্যে' খুব কাজে লাগে): তাকে জিগেস করো, মেক্সিকোর কোন লেখক সবচেয়ে বিখ্যাত, অস্ট্রেলিয়ার কনস্টিট্যুশন কী, থিওরি অব নম্বর্স কাকে বলে, পজিট্রন-নিউট্রন কী-জিনিশ, পৃথিবীতে পা-দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন কে, সোশ্যালিজাম আর কম্যুনিজম-এ

তফাৎ কী, তক্ষুনি সে নির্ভুল জবাব দিয়ে দেবে। পৃথিবীর এমন-কোনো বড়ো কবি বা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক নেই, যাঁর সম্বন্ধে বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুরে সে কথা না বলে, প্রতি মাসের নতুন বইয়ের নাম তার রসনাগ্রে সর্বদা চুলবুল করছে। ম্যাট্রিকে কুড়ি টাকা স্কলারশিপ তো কত ছেলেই পায়, কিন্তু এমন ছেলে ক'টা হয়।

অমিয়াংশুবাবু তখন বগুড়ার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। ছেলেকে হস্টেলে রেখে, কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে তিনি সপরিবারে কর্মস্থলে ফিরলেন। গুপ্ত যখন আছে, ছেলের দেখাশোনার জন্য ভাবতে হবে না। দেখাশোনার জন্য ভাবনা ছিলো না এমনিতেও, স্মরজিৎ সমস্ত বিষয়েই স্বাবলম্বী। অভ্রান্ত নিয়মে দিন কাটে তার। সকালে কলেজ যাবার আগে ঠাশা চার ঘণ্টা পড়াশুনো সে করবেই। রাত জেগে কখনো পড়ে না, পাছে শরীর খারাপ হয়। হস্টেলের খাওয়া যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়, নিজের ঘরে ডিম রুটি চীজ বিস্কুটের বন্দোবস্ত আছে তার। ব্যায়াম করতে একদিনও ভোলে না। বিকেলে কখনো টেনিস খেলে, কখনো বাছা-বাছা দু' চারটি বড়োলোকের ছেলের সঙ্গে আড্ডা দেয়, কখনো ঘরে ব'সে রবীন্দ্রনাথ পড়ে—আই. সি. এস.-এ বাংলা পরীক্ষাও দিতে হবে তো। মাঝে-মাঝে সিনেমায় যায়, কেননা অনেক-কিছু জানা যায় সিনেমা দেখলে। নিয়ম ক'রে সপ্তাহে দু'দিন গুপ্তর বাড়িতে যায়, কিন্তু

নিমন্ত্রণ না-করলে খায় না। বিশাখা ততদিনে শাড়ি ধরেছে, নখে ঠোঁটে রং লাগাতে শিখেছে, কিন্তু স্মরজিৎ তাকে বেশি লক্ষ্য করে না, তার বেশির ভাগ কথা গুপ্ত-সাহেবের সঙ্গেই। একতলায় মেম-মাস্টারনির কাছে ইংরেজি পড়া শেষ ক'রে বিশাখা ফিরে এসে একটু দূরে একটা চেয়ারে বসে, স্মরজিৎ যাবার সময় তার কাছে দাঁড়িয়ে বলে, 'ভালো আছো, শাখা?' বিশাখা বলে, 'তুমি ভালো আছো?' তারপরই স্মরজিৎ নেমে যায়।

এ-বিয়ে ঠিক করবার পরেই গুপ্ত-সাহেব মেয়েকে ব্রাহ্ম গালর্স স্কুল থেকে ছাড়িয়ে লোরেটো হাউসে ভর্তি করেছিলেন। দু'বছর পরে নতুন বাড়িতে যখন উঠে এলেন, তখন থেকে উঠে-প'ড়ে লাগলেন মেয়ের পিছনে। স্মরজিৎ আই. সি. এস. হবার জন্য তৈরি হ'তে লাগলো, বিশাখা তৈরি হ'তে লাগলো আই. সি. এস-এর স্ত্রী হবার জন্য। ইশকুলের পড়া তৈরি করতে সারা সকাল যায়—সে-পড়ার বহর এত লম্বা যে ইশকুল থেকে এসেই আবার বসতে হয়। তারপর সন্ধ্যাবেলা আছে বিবিধ উপসর্গ। সোম আর শুক্রবার গানের ওস্তাদ আসেন, তিনি খেয়ালে তালিম দেন, বুধবারে আর-একজন আসেন রবীন্দ্রসংগীত শেখাতে। মঙ্গল আর শনিবার আসেন মিস হ্যারিস, তিনি ইংরেজি বুকনি অভ্যাস করান আর ফ্রেঞ্চ তর্জমাটা ঘ'ষে-মেজে দেন। মঙ্গলবার বিকেলে একজন বিধবা মহিলা

আসেন শেলাই শেখাতে। বুধবার বিকেলে আর রবিবার সকালে আসেন ছবি আঁকার মাস্টার। এই সব ক'রে উঠে যেটুকু সময় বাকি রইলো তাতে গানের রেওয়াজ করতে হবে, বটগাছের ছবিতে রং চড়াতে হবে, স্মকিং-এর ফোঁড় তুলতে হবে, ফরাশি ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হবে। অতটুকু মেয়ের পক্ষে এ কি সম্ভব ? কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব কি ? এখানেও শেষ নয় ; বাড়িতে অতিথি এলে গান শোনানো আছে ; স্কুলে, বাড়িতে কিংবা বাবার কোনো বন্ধুর বাড়িতে অমিশোল মেয়ে-নাটকে অভিনয় করা আছে—কখনই বা পার্ট মুখস্থ করে, কখনই বা রিহার্সেলে যায়, কিন্তু করতেই হবে, বাবা ছাড়বেন না তা না-হ'লে—তবু কী ভাগ্যিশ বাবা মেয়েদের নাচা পছন্দ করেন না, নয়তো এর উপরে আবার নাচতে হ'তো।

এত সে কেন শিখবে, কখন শিখবে, কেমন ক'রে শিখবে, এ-প্রশ্ন ছেলেমানুষ-বিশাখার মনেও উঠতে পারতো, কিন্তু ওঠেনি কখনো। অত্যন্ত মৃদু তার স্বভাব, মাথা পেতে মেনে নিয়েছে বাবার নির্দেশ, তার শক্তি অনুসারে প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে, ফল ভালো না-হ'লে মন খারাপ করেনি, চলনসই গোছের হ'লেই খুশি হয়েছে। খুব ভালো কোনোটাতেই তার হবে না, এ-কথা অল্প বয়স থেকেই সে কেমন একরকম বুঝে নিয়েছিলো—অথচ সবই তাকে করতে হবে, এ-সব করবার জন্যই তো সে আছে।

এই ভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগলো, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কখনো খেয়ালের ওস্তাদের বদলে এলেন বেহালায় বিলেতি বাজনা শেখাবার ইহুদি মাস্টার, কখনো রবীন্দ্র-সংগীতের বদলে পিআনোর শিক্ষয়িত্রী, কখনো ছবি আঁকার ফাঁকে-ফাঁকে চামড়ার উপরে বাতীকের কাজ শেখা হ'লো। শেখা হ'লো মানে দেখা হ'লো। কেউ একজন করলো, সে শুধু দেখলো ব'সে-ব'সে। মনে-মনে ভাবলো, এ-জগতে আরো কত বিদ্যে আছে কে জানে! এ-ও একবার ভাবলো—বিয়েটা হ'য়ে গেলে বাঁচি।

ততদিনে সে বড়ো হয়েছে। তার জন্য আসছে রাশি-রাশি শাড়ি, ঝুড়ি-ঝুড়ি গয়না। ভালোই লাগে তার, এ তো বিয়েরই আয়োজনের আরম্ভ। এ-সব শাড়ি-গয়না যে শুধু-শুধু ভালোবেসেই আনা হচ্ছে না, সমস্তই যে তার বিয়ের খরচ থেকে কাটা যাচ্ছে এ-কথা বাবার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে। গুপ্ত-সাহেব আজকাল কন্যার সঙ্গে বিশেষ-একটু সযত্ন ব্যবহার করেন, মাঝে-মাঝে তাকে নিয়ে এমন-সব বাছা-বাছা সিনেমায় যান, যাতে প্রখর আদিরসাত্মক কোনো দৃশ্য নেই (এ-জন্য বেশির ভাগ ফিল্ম আগে তিনি নিজে দেখে নেন); বিশাখা খুব ঘটা ক'রে সেজে মুখে-চোখে রং-কালি মেখে মা-বাবার সঙ্গে বক্সে নিয়ে বসে—সিনেমা দেখতে তার ভালো লাগে, কিন্তু খুব ভালো লাগে না। খুব ভালো কিছুই লাগে না তার।

মা-বাবার সঙ্গে বছরে ছ'একবার তাঁদের কোনো বন্ধুর বাড়িতেও যায় সে, গিয়ে একটি কথা বলে না, কারো দিকে তাকায় না, মাথা নিচু ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকে সারাক্ষণ। সমবয়সি কোনো বন্ধু তার নেই, সেজন্য কোনো অভাববোধও নেই। লোরেটোয় বাঙালি মেয়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়, যে-ক'টি আছে তারা বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া কেউ কারো বাড়িতে যায় না। দামি উপহার নিয়ে ক্লাশের মেয়েদের জন্মদিনের নিমন্ত্রণে যায়, কিংবা তার জন্মদিনে সমান দামের উপহার নিয়ে তারা আসে—খাওয়া-দাওয়া, খেলা, হেঁয়ালি, এক-আধটু নির্দোষ ফাজলেমি, সবই হয়—কিন্তু সবই ঠিক মাপ-মতো, সবই হিশেব করা; সন্ধে পেরোতেই যে যার গাড়িতে উঠে বাড়ি ফেরে, আর তার পরেই হয়তো ইংলণ্ডের রাজাদের নামের নামতা মুখস্থ করতে বসতে হয়, কিংবা বেহালা শিখতে ব'সে বেহালাটা এমন কাঁদে যে নিজেরই কান্না পায়।

দৈবাৎ এক-আধ দিন এমন হয় যে সন্ধেবেলা তার হাতে কিছুই থাকে না। মা-বাবা হয়তো নেমন্তন্নে বেরিয়েছেন, ভাইয়েরা নিচের ঘরে মাস্টারের কাছে পড়ছে, মস্ত বাড়িটায় নিজেকে একটু একা লাগে তার। রেডিওর কাছে ব'সে যা হচ্ছে তা-ই মন দিয়ে শোনে, খানিক পরে উঠে এসে বসে ঘরের সংলগ্ন বারান্দায়। আলো জ্বালে না, তাকিয়ে দেখা যায় অস্পষ্ট গাছপালা, খানিকটা আকাশ, কয়েকটি তারা।

হঠাৎ তার মনে হয় তার জীবনে যেন কোনো আশা নেই, অর্থ নেই, উদ্দেশ্য নেই, ।. কিসের জন্য এত সব, কিসের জন্য শাড়ি-গয়না, কিসের জন্য ছবি গান ইতিহাস অঙ্ক রবীন্দ্র-সংগীত? এর পরে কী হবে তা সে জানে, তার পরে কী হবে তাও জানে, তারও পরে জানে। মা-বাবা আজকাল আলাদা ঘরে শোন; সে যখন ছোটো ছিলো তাকে নিয়ে একসঙ্গেই শুতেন; আবছা মনে পড়ে হঠাৎ এক-এক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে হাত বাড়িয়ে মা-কে সে পেতো না, ভয় করতো। সবই তো জানা, সবই তো পর-পর সাজানো আছে। নতুন কিছু হবে না তার জীবনে, এমন-কিছু হবে না যাতে সে অবাক হবে, যা তাকে হাসাবে, কাঁদাবে, নাচাবে, পাগল ক'রে দেবে। তাহ'লে কেন এ-সব?

বিশাখার মনে এ-সব কথা কোথা থেকে এলো? কোনো কবিতায় কি পড়েছিলো, কোনো ফিল্মে কি শুনেছিলো? কিন্তু কবিতা যাঁরা লেখেন, গল্প যাঁরা বানান, তাঁরা এ-সব কোথায় পান? তাঁদের আগে যাঁরা লিখে গেছেন তাঁদের বই থেকে? প্রাচীনরা প্রাচীনতরদের কাছে? কিন্তু একদিন তো পৃথিবীতে প্রথম কবিতা লেখা হয়েছিলো, সেদিন কোথা থেকে এসেছিলো এ-কথা?

অবশ্য বিশাখার মনে এ-সব কথা উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যায়, পরে সে নিজের কাছেই লজ্জিত বোধ করে। যদিও

কাছাকাছি কেউ নেই, আর থাকলেও তাকে দেখে বুঝবে না সে কী ভাবছে, তবু ত্রস্ত চোখে চারদিকে তাকায়, তারপর দ্রুত বেগে বারান্দা থেকে চ'লে আসে পড়ার ঘরে, খাতা কলম বের ক'রে কলকাতার দৃশ্যবস্তু সম্বন্ধে ইংরেজি রচনা লিখতে বসে।

এমনি এক হঠাৎ-ছুটি-পাওয়া সন্ধ্যায় স্মরজিৎ এলো। বিশাখা ড্রয়িংরুমে ব'সে একটি বিলেতি স্বরলিপির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলো, তাকে দেখে চোখ তুলে বললে, 'এসো।'

স্মরজিৎ তখন থর্ড ইয়ারে। ততদিন পাকা যুবক হয়েছে সে, চেহারাটি ভরেছে, কামানো দাড়ির নীলচে আভার পুরুষালি শ্রী যদিও তখনও ফোটেনি, সরু একটু গোঁফ রেখে সেটা পুষিয়ে নিয়েছে। বয়সের তুলনায় একটু বড়োই দেখায় তাকে। সেটা দরকার, তেইশ বছর বয়সে একটা মহকুমার কর্তা হ'তে হবে তো। ছেলেমানুষ দেখালে, কিংবা ছেলেমানুষি ভাব থাকলে চলবে না।

স্মরজিৎ জিগেস করলে, 'তোমার বাবা কোথায়, শাখা?'

'মা বাবা দু'জনেই বেরিয়েছেন।'

'কখন ফিরবেন?'

'দেরি হবে। প্রথমে তাঁরা সিনেমায় যাবেন, সেখান থেকে একটা বিয়ের নেমন্তন্নে।'

'তুমি গেলে না যে?'

বিশাখা হঠাৎ বললে, 'আমি গেলে কি ভালো হ'তো? অত দূর থেকে তুমি এসে ফিরে যেতে।'

স্মরজিৎ বিশাখার দিকে একবার তাকিয়ে একটু গম্ভীর হ'লো।

'দাঁড়িয়ে আছো কেন? বোসো।'

বিশাখা ব'সে ছিলো একটা লম্বা সোফায়, সৌজন্যসূচক প্রচুর ব্যবধান রেখেও ওটাতে বসা যেতো, কিন্তু স্মরজিৎ অন্য একটা চেয়ারে ব'সে বললে, 'তোমার পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?'

'ভালো।'

'আজ তোমার মাস্টাররা কেউ আসেননি?'

'নাঃ', নিজের অজান্তে ফোঁশ ক'রে একটা নিশ্বাস পড়লো বিশাখার। স্মরজিৎ বইটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'পিআনো শিখছো?'

'শিখছি কি আর—ঐ একরকম—'

'একটু বাজাও না।'

'পারি না।'

'পারবে, পারবে, চেষ্টা করলেই পারবে।' স্মরজিৎ উৎসাহ দিয়ে বললো। 'আমি ছেলেবেলায় অঙ্কে ভীষণ কাঁচা ছিলুম, জানো তো। একবার হাফ-ইয়ালিতে বারো পেয়েছিলুম। তারপর অঙ্ক নিয়ে এমন উঠে-প'ড়ে লাগলুম যে ছ'মাসে সমস্ত অ্যারিথমেটিক অ্যালজেব্রা জল-ভাত হ'য়ে গেলো। তারপর আর কোনো পরীক্ষাতেই নব্বুইয়ের নিচে নামেনি।'

বিশাখা একটু হেসে বললো, 'আমি কি আর তোমার মতো!'

কথাটা শুনে স্মরজিৎ খুশি হ'লো। বিশাখার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললে, 'তোমার কানের গয়নাটা নতুন দেখছি।'

বিশাখা কানে একবার হাত দিয়ে একটু লজ্জা-লজ্জা ভাবে চুপ ক'রে রইলো।

'বেশ মানিয়েছে।'

'কী বললে?'

'বললুম, ভালো হয়েছে।'

'ভালো হয়েছে, না ভালো দেখাচ্ছে।'

'ও একই কথা।'

'না—একই কথা হবে কেন?' বিশাখা একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বললে, 'এই মস্ত-মস্ত চেয়ার-সোফাগুলোর একটা অসুবিধে এই যে দু'জনে দূরে-দূরে বসতে হয়, ভালো ক'রে গল্প করা যায় না। তুমি এখানে এসো না।'

'আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।'

'এক্ষুনি যাবে?'

'হ্যাঁ, যাই—কাকাবাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিলো, তা তাঁর আসতে তো দেরি হবে বলছো।' স্মরজিৎ উঠে দাঁড়ালো।

বিশাখা হঠাৎ হেসে ফেলে বললে, 'আরো বড়ো হ'লে তুমি ঠিক আমার বাবার মতো হবে।'

'তোমার বাবার মতো হ'তে পারলে তো ভালোই।'

'ভালো ব'লেই তো বলছি। পৃথিবীর সমস্ত ভালোর তুমিই তো নিদর্শন', বিশাখা আবার হাসলো, এবার খিলখিল ক'রে।

'ও-রকম হাসছো কেন বার-বার?'

'কী জানি,' স্মরজিতের চোখের দিকে তাকিয়ে বিশাখা থমকে গেলো।

'এ-রকম খামকা হাসতে তো তোমাকে দেখিনি কোনোদিন। আজ তোমার হয়েছে কী?'

বিশাখা বললে, 'চলো না বারান্দায় গিয়ে বসি। এখানে বড্ড গরম।'

'এমন আর গরম কী। পাখা চলছে তো।'

'আমার ভালো লাগছে না, আমি যাই,' স্মরজিতের দিকে আর না-তাকিয়ে বিশাখা হনহন ক'রে বারান্দায় গিয়ে একটি ইজি-চেয়ারে এলিয়ে পড়লো।

স্মরজিৎ তার পিছন-পিছন এসে বললে, 'কী হ'লো? শরীর খারাপ হয়নি তো?'

'হ্যাঁ, মাথা ধরেছে বড্ড।'

'মাথা ধরেছে!' স্মরজিত ব্যস্ত হ'য়ে দেয়াল হাৎড়ে আলো জ্বাললো। 'কই, দেখি। তাই তো, চোখ যে ছলছল করছে। জ্বর না হয় আবার।' ঝুঁকে প'ড়ে বিশাখার কপালে হাত রেখে বললে, 'গা-টা তো একটু গরমই মনে হচ্ছে।'

সবেগে তার হাত সরিয়ে দিয়ে বিশাখা বললে, 'তুমি কি ডাক্তার নাকি? গায়ে হাত দিয়ে জ্বর বলতে পারো!'

স্মরজিৎ বললে, 'ডাক্তার হ'লে ভালো ডাক্তারই হতাম। এই ছাখো না তোমাকে সারিয়ে দিচ্ছি। বাড়িতে অ্যাস্পিরিন আছে নিশ্চয়ই? ল্যাভেণ্ডরও আছে?'

'কোথায় কী আছে আমি জানি না।'

'কী ছেলেমানষি করো—বলো না কোথায় আছে।'

'বলছি, জানি না!'

'তাহ'লে দোকান থেকে আনিয়ে দিই। মাথা-ধরায় এ-রকম কষ্ট পাওয়া কি ভালো? হুটো অ্যাস্পিরিন খেয়ে কপালে একটু ল্যাভেণ্ডরের জল-পটি লাগিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে থাকো—সেরে যাবে।'

'না, না, অ্যাস্পিরিন আমি খাবো না।'

'সে কী কথা! অ্যাস্পিরিন খাবে না কেন? ওতে হার্ট খারাপ হয় শুনেছো বুঝি? ও কিছু না—বেশি ক'রে একটু জল খেয়ো, তাহ'লেই অ্যাস্পিরিনের দোষ কেটে যাবে।'

'ম'রে গেলেও অ্যাস্পিরিন খাবো না আমি। উঃ, আলোটা নিবিয়ে দাও,' বিশাখা হু'হাতে চোখ ঢাকলো।

'থাক না। খুব কি অস্থবিধে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, অস্থবিধে হচ্ছে, খুব অস্থবিধে হচ্ছে,' বিশাখা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

আলো নিবিয়ে দিয়ে স্মরজিৎ আবার এসে দাঁড়াতেই বিশাখা

বললো, 'তুমি না তখন যাচ্ছিলে? যাও না—দাঁড়িয়ে আছো কিসের জন্য?'

'তোমাকে অসুস্থ ফেলে কেমন ক'রে যাই।'

'রোগীর পরিচর্যাই বুঝি তোমার পেশা?'

'তুমি আজ বড্ড বাজে বকছো, শাখা!'

'বেশ তো, বাজে কথা শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও না তুমি!'

একটু চুপ ক'রে থেকে স্মরজিৎ বললে, 'ওঁরা কোন সিনেমায় গেছেন বলো তো? টেলিফোনে একটা খবর দেবার চেষ্টা করি।'

'কেন, খবর দেবার কী হয়েছে? আমি কি ম'রে যাচ্ছি?'

'তাহ'লে অনিল-সুনীলদের ডেকে আনি নিচে থেকে।'

'কিছু-একটা না-করলে বুঝি তোমার বিবেক মানছে না? তাহ'লে এক কাজ করো—আমার কাছে এসে বোসো, মাথাটা একটু টিপে দাও।'

'আমি—মাথা-ধরার মাসাজ আমি ঠিক জানি না।'

হাসি-কান্নার মাঝামাঝি অদ্ভুত একটা আওয়াজ ক'রে বিশাখা হেসে উঠলো। অত্যন্ত অবাক হ'য়ে স্মরজিৎ বললে, 'নাঃ, শরীরে কিছু-একটা গোলমাল হয়েছে তোমার। বোধহয় লিভর-ফঙ্কশন ভালো হচ্ছে না। ডাক্তার দেখানো উচিত।'

'ডাক্তার···হ্যাঁ, ডাক্তার···উঃ!' হাসতে-হাসতে বিশাখা গোল হ'য়ে গেলো।

'আমি কি হাসির কথা কিছু বলেছি?' স্মরজিতের কথায় যেন আস্ত রাইটর্স বিল্ডিং-এর গাম্ভীর্য।

'না, না···হাসির কথা···'

আর-কোনো কথা বিশাখা বের করতে পারলো না মুখ দিয়ে। এক ঝটকায় উঠে কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে চ'লে গেলো শোবার ঘরে, আছাড় খেয়ে পড়লো বিছানাটার উপর, বালিশে মুখ চেপে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে-কাঁদতে তার জিভ শুকিয়ে গেলো, নাক বন্ধ হ'লো, দম আটকে এলো—তবু কান্না থামে না।

স্মরজিৎ পরদার বাইরে দাঁড়িয়ে কান্নার শব্দ শুনতে-শুনতে ভাবতে লাগলো ঘরে ঢোকা তার উচিত হবে কিনা। বিমূঢ় সে কখনোই হয় না, যে-কোনো অবস্থায় নিজের কর্তব্য ঠিক বুঝতে পারে—চটপট মনস্থির করতে না-পারলে আই. সি. এস.-এর কাজ চালানো শক্ত—কিন্তু এখন তার মনস্থির করতে একটু সময় লাগলো, কেমন-একটু বিমূঢ়ই হ'য়ে পড়লো সে। মনের জোরে সে-ভাবটা কাটিয়ে উঠলো, নিঃশব্দে স'রে এলো দরজার কাছ থেকে। না, ঘরে ঢোকাটা ঠিক হবে না তার, শাখা তো আর ছেলেমানুষ নেই। ও কেন কাঁদছে তা যদি সে জানতো, সেই কারণটা দূর করবার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগতো নিশ্চয়ই, কিন্তু তা যখন জানে না, জানবার উপায়ও নেই, তখন আর কী করা যাবে। কোনো কারণ, উপলক্ষ্য কিংবা অর্থ নেই,

অথচ কেউ. যদি পাগলের মতো কাঁদে, সেটাকে সাময়িক পাগলামি ব'লেই ধ'রে নিতে হবে—সে-সম্বন্ধে কিছু করতে যাওয়াই ভুল, যথাসময়ে আপনিই সারবে। স্মরজিৎ তার বয়সে নানারকম বই-ই পড়েছে, এ-খবরটাও সে রাখে যে বিশেষ-একটা বয়সে মেয়েদের মন-মেজাজের বড্ড ওলোট-পালোট হয়। এ-ও হয়তো তা-ই। একা-একা শুয়ে থাক, কাল সকালে উঠে আজকের কথা ভেবে লজ্জিত হবে নিজেই।

স্মরজিৎ ভুল ভাবেনি ; এই কান্নার কথা মনে ক'রে অনেক দিন পর্যন্ত বিশাখার ম'রে যেতে ইচ্ছে করেছে লজ্জায়। কেন সেদিন ও-রকম করেছিলো সে, কেন হেসেছিলো, কেঁদেছিলো, কী সে চায়, কিসের দুঃখ তার, এ-সব কোনো কথাই তার কাছে স্পষ্ট নয়। সব তার মনেও পড়ে না ; কী বলেছিলো, কী করেছিলো সবই ঝাপসা লাগে ; সেদিনের কথা ভাবলে এইটে শুধু তার মনে হয় যেন সে একটা নৌকোয় যেতে-যেতে হঠাৎ গভীর জলে প'ড়ে যাচ্ছিলো, অনেক কষ্টে সামলে বেঁচে উঠেছে। সেই বেঁচে ওঠার কৃতজ্ঞতায় সে দ্বিগুণ বেগে মন দিলো নির্দিষ্ট কর্মতালিকায়। পড়া তৈরি করে, গায়, বাজায়, ছবি আঁকে, পুতুলের মতো সেজে ড্রয়িংরুমে বসে, ঝলমলে হ'য়ে মা-বাবার সঙ্গে সিনেমায় যায়, বড়োদের পার্টিতেও যায় মাঝে-মাঝে। সপ্তাহের প্রতিটি দিন, দিনের প্রতিটি ঘণ্টা যে কাজ আর আমোদের, খাওয়া আর ঘুমোনোর নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা,

এই নিশ্চিন্ত নিষ্কম্প্র স্থায়িত্ব তার দেহে এক পরদা মেদের চেকনাই আনলো। যেদিন কেঁদেছিলো সেদিন তার বয়স ছিলো চোদ্দ, তারপর তার পনেরো হ'লো, ষোলো হ'লো, সতেরো, আঠারো হ'লো কিন্তু ও-রকম দুর্ঘটনা আর ঘটলো না।

সে-বছর সে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করলো, আর স্মরজিৎ আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে বেরুলো। খবরটা পাওয়া গেলো জুন মাসে, সেপ্টেম্বরে সে বিলেত যাবে। তার আগে বিয়েটা সারতে হয়।

তখন ইওরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। হিটলার অর্ধেক ইওরোপ দখল করেছে, ইংলণ্ডে বোমা পড়ছে ঘন-ঘন। বিশাখার মা অমলা দেবী স্বামীকে বললেন, 'বিয়েটা এখনই দেবে, না ফিরে এলে—'

গুপ্ত বললেন, 'না, না, আর দেরি না। এই শ্রাবণ মাসেই—'

'বিলেতে যে-রকম বোমা-টোমা পড়ছে শুনছি—'

গুপ্ত গলা চড়িয়ে বললেন, 'ছী-ছি, এ-কথা তুমি ভাবতে পারলে! মেয়ের কপালে যদি দুঃখ থাকে তো খণ্ডাবে কে?'

অমলা দেবী বললেন, 'তা বলছিলাম না, তবে একটা উদ্বেগ তো। চিঠিপত্রও সময়মতো আসবে না—'

'বিয়ে না-হ'লেই কি উদ্বেগ কম হবে? ওকে তো আমরা জামাই ছাড়া কিছু ভাবি না।'

'আমাদের কথা নয়, শাখার কথা ভাবছিলাম।'

'শাখার পক্ষেও একই কথা।'

'তবু—বিয়ে হওয়া আর না-হওয়াতে তফাৎ আছে।'

গুপ্ত বললেন, 'তা আছে ব'লেই তো বিয়েটা এখনই হওয়া ভালো। আমি বিয়ে ক'রেই বিলেত গিয়েছিলাম, আমার জামাইও তা-ই যাবে—ভাবতে ভালোই লাগছে আমার।'

ভালোই, অমলা দেবী মনে-মনে ভাবলেন। 'বিলেতে' যে যায় তার বোধহয় ভালোই লাগে। কিন্তু যে প'ড়ে থাকে? কোন সুদূরের স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে এলো। তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে আইসক্রীম বানাতে বসলেন।

গুপ্ত স্মরজিৎকে বললেন, 'বিলেত যাবার আগেই কিন্তু বিয়ে।'

স্মরজিৎ বললে, 'কেন, আপনার কি ভয় হচ্ছে আমি বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করবো? আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন আমাকে—আপনার কন্যাকে ছাড়া অন্য-কোনো মেয়েকে স্ত্রী ব'লে ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

কথা শুনে গুপ্ত অবাক হলেন, কিন্তু আই. সি. এস. হ'লে মানুষ একটু উদ্ধত হয়ই, এটা মেনেই নিতে হবে। বললেন, 'সে-কথা নয়—আমি জিগেস করছিলাম, এখন বিয়ে করতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'না, আপত্তি কিসের।'

'তোমার বাবারও তা-ই ইচ্ছা।'

'বেশ তো। বিয়ে তো হবেই—যে-কোনোদিন হ'লেই হয়।'

এর পরে গুপ্ত মেয়েকে বললেন, 'শ্রাবণ মাসেই বিয়েটা হ'য়ে যাক, কেমন ?'

বিশাখা ক্ষীণস্বরে বললে, 'আমাকে আর জিগেস করছো কেন, বাবা।'

'তোর বিয়ে, তোকে জিগেস করবো না ?'

কথাটা শুনে বিশাখার চমক লাগলো। সত্যি তো, তারই বিয়ে। বুকের ভিতরটা ছুরছুর ক'রে উঠলো তার।

বিয়েতে অনেক ঘটা হ'লো। গুপ্ত খরচ ধ'রে রেখেছিলেন পঁচিশ হাজার, কিছু বেশি হ'লো। যৌতুকের মধ্যে টালিগঞ্জে এক খণ্ড জমি এবং একটি মোটর-গাড়িও ছিলো। অমিয়াংশুবাবু তখন বাঁকুড়ায়—সেখানে গাড়ি চালাবার পথ-ঘাট আছে, ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে সগর্বে স্বস্থানে ফিরলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। গুপ্ত আকণ্ঠ খুশি করেছেন তাঁকে, গা বেয়ে খুশি ঝরছে।

বিয়ের লগ্ন ছিলো রাত বারোটায়, স্ত্রী-আচারের হাঙ্গামা শেষ ক'রে বর-কন্যার শুতে-শুতে প্রায় তিনটে বাজলো। যে-ঘরে বিশাখা আট বছর ধ'রে মা-র সঙ্গে শুয়েছে, যে-ঘরে চার বছর আগে একদিন সে কেঁদেছিলো, আজ তার বাসর-শয্যা সেই ঘরে। মা-র বিয়ের উঁচু, চওড়া জমকালো-কাজ-করা খাট সরিয়ে তার বিয়ের নিচু, নিরাভরণ, ছিমছাম জোড়া-খাট পাতা হয়েছে ; কিন্তু বিয়ের রাত্রে খাটে শুতে নেই, মেঝেতে গদির উপর সিলেটের চিকন পাটি বিছোনো, সেখানে ব'সে-ব'সে তারা চাল খেলেছে,

জলে শোলা ভাসিয়েছে, বর্ষীয়সীদের ঠাট্টা সহ্য করেছে—সেখানেই বাকি রাতটুকু তারা শোবে। এক কোণে জ্বলছে প্রদীপ, ঘরের মধ্যে ফুল, চন্দন আর বিলিতি এসেন্স মেশানো একটা গন্ধের আচ্ছন্নতা।

যে-মুহূর্তে তারা একা হ'লো, স্মরজিৎ ব'লে উঠলো, 'উঃ, কী-সব অসভ্য প্রথা! কবে যাবে এগুলো দেশ থেকে।' ব'লেই উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বাধা পেলো। আঁচলে-আঁচলে গেরো বাঁধা। গাঁটছড়া খুলতে-খুলতে আবার বললো, 'বিয়ে করা এত কষ্ট কে জানতো। তোমার ঘুম পায়নি?'

বিশাখা জবাব দিলো না।

'সাত পা হাঁটলেই তো আইনের চোখে বিয়ে হ'য়ে যায়—এগুলো আর কেন? এর পরেও আরো কী-সব আছে শুনছি। একেবারে মেরে ফেলবে!' বিশাখাকে নিরুত্তর দেখে স্মরজিৎ আবার বললো, 'ঘুমুলে নাকি?'

'না।'

'চটপট ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করো, কাল সকাল থেকেই তো আবার আছে', বলতে-বলতে স্মরজিৎ উঠে দাঁড়ালো। 'আমি যাই—একটু হাত-পা ছুঁড়ে আসি। এতক্ষণ ঠায় ব'সে থেকে-থেকে গা ব্যথা হ'য়ে গেছে।'

স্মরজিৎ বাথরুমে ঢুকলো, বিশাখা শুয়ে-শুয়ে শুনলো তার ব্যায়াম করার হুশহুশ শব্দ, তারপর জলের ছলছলানি।

মিনিট দশেক পরে বেরিয়ে এলো শাদা পাজামা আর গেঞ্জি প'রে। গেঞ্জি-পরা স্মরজিৎকে বিশাখা বড়ো হ'য়ে কখনো ছাখেনি, তার কেমন লজ্জা করলো। বললে, 'বিয়ের কাপড় ছাড়লে কেন ?'

'বাব্-বাঃ ! ও-সব প'রে মানুষ শুতে পারে ! তুমি ও-সব জবড়জং প'রেই থাকবে নাকি ?'

'বিয়ের রাতে বিয়ের কাপড় ছাড়তে নেই।'

'ও-সব কুসংস্কার তোমারও আছে !' স্মরজিৎ হাসলো।

'গরদের পাঞ্জাবিটা পরো না—বেশ দেখাচ্ছিলো।'

'না, না—গেঞ্জি প'রে শোওয়া আমার অভ্যেস।' স্মরজিৎ শুয়ে পড়লো। হঠাৎ বললো, 'অতগুলো গয়না প'রেই ঘুমুবে ? অসুবিধে হবে না ?'

কথা না-ব'লে বিশাখা পাশ ফিরলো। রিনিঠিনি বেজে উঠলো চুড়ি। এই মৃদু আওয়াজটি তার নিজেরই ভারি ভালো লাগলো, ভারি নতুন ঠেকলো কানে। এর আগে হাজার বার গয়নার আওয়াজ হয়েছে তার গায়ে, কিন্তু এমন কখনো লাগেনি।

'ওঃ-হো ! দরজাটা বন্ধ আছে তো ?' স্মরজিৎ লাফিয়ে উঠলো। মিটিমিটি আলোয় সুন্দর দেখালো তার বেতের মতো শরীর। দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে আবার এসে শুলো, বেড়ালের মতো একবার গায়ের আড়মোড়া ভেঙে বললে, 'ওদিকে ফিরে আছো কেন ? শোনো একটা কথা।'

বিশাখা আবার পাশ ফিরলো। রিনিঠিনি বাজলো চুড়ি।

স্মরজিৎ তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'কেমন লাগছে ?'

বিশাখা চোখ বুজে জোরে-জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলো।

স্মরজিৎ গম্ভীর স্বরে বললো, 'আমাকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হয়েছো ?'

'তুমি ?'

'আমি নিশ্চয়ই সুখী হয়েছি—না-হয় আই. সি. এস.ই হয়েছি, তবু এর চেয়ে ভালো বিয়ে আমার আর-কী হ'তে পারতো ? কিন্তু তোমার বাবা মস্ত ধনী—তিনি হয়তো এর চেয়েও ভালো বিয়ে তোমার দিতে পারতেন। এ-কথা কি কখনো তোমার মনে হয় ?'

'এ-বিয়েও তো বাবাই দিলেন।'

'তা-ই বলছি। যা-ই হোক, আশা করি অনুশোচনা তাঁকে কখনো করতে হবে না। তোমাকে সুখী করবার আপ্রাণ চেষ্টা আমি করবো, শাখা।' একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, 'আমরা এখন স্বামী-স্ত্রী।' তারপর মুখ বাড়িয়ে বিশাখার মুখের উপর চুম্বন ক'রে পাশ ফিরতে-ফিরতে বললে, 'এখন ঘুমোও—আর জাগলে কাল আর দাঁড়াতে পারবে না।'

একটু পরেই স্মরজিৎ ঘুমিয়ে পড়লো।

বিয়ের হৈ-চৈ চুকতে দিন দশেক লাগলো। তারপর দু'জনে

গেলো বাঁকুড়া, সেখানে আর-এক প্রস্থ হৈ-চৈ। সে-পালা যখন শেষ হ'লো তখন স্মরজিতের বিলেত রওনা হবার আর এক মাস মাত্র বাকি।

এই এক মাস কলকাতা-বাঁকুড়া টানা-পোড়েনে কাটলো। বিশাখা রইলো কলকাতায়। সবই সে-রকম আছে, সেও কিছু বদলায়নি, শুধু একজনের স্ত্রী হয়েছে ব'লে কোনোরকম বিদ্যা-শিক্ষার আর তার প্রয়োজন নেই। গানের ওস্তাদ, ছবির মাস্টার, শেলাইয়ের শিক্ষয়িত্রী সকলেই বিদায় হলেন; বেহালা পিআনো ফ্রেঞ্চ গ্রামারের ভূত নামলো ঘাড় থেকে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বিশাখা।

বাঁচলো—মানে, ছোটো-ছোটো গুরুর হাত ছাড়িয়ে বড়ো গুরুর হাতে পড়লো। স্মরজিৎ তার ছাত্রজীবনের অনেকগুলি বই এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছে—বিশাখার সেগুলি পড়া চাই। মার্ক্স, ফ্রয়েড, আইনস্টাইন সবই নাকি বুঝতে হবে তাকে, নয়তো সে 'এ-যুগের উপযোগী' হ'তে পারবে না। বইগুলোর পাতা উল্টিয়ে বিশাখা অবাক হ'য়ে যায়। বাপরে, এ-সব বই পড়েছে স্মরজিৎ? প'ড়ে বুঝেছে!

বইগুলোর মধ্যে কালো মলাটের মোটাসোটা একখানা বই ছিলো, একদিন সেটা বের ক'রে স্মরজিৎ বললো, 'এটা পড়েছো?'

বিশাখা মাথা নাড়লো। সত্যি বলতে, কোনো বই-ই সে পড়েনি।

'এটা পোড়ো। এটা পড়া তোমার অত্যন্ত দরকার।'

বিশাখা একবার বইটার নামের দিকে, একবার স্মরজিতের মুখের দিকে তাকালো।

'তোমার বুঝি অবাক লাগছে? এ-সব বিষয়ে যে বই আছে তা বুঝি জানতেও না?'

'কী হয় এ-সব প'ড়ে?'

'কী হয় মানে? প্রত্যেক লোকের বিয়ে করবার আগে এ-বিষয়ে পড়া উচিত।'

বিশাখা বইখানা হাতে নিয়ে পাতা উল্টিয়ে দেখলো। পাতায়-পাতায় লাল পেনসিলের দাগ। স্মরজিৎ খুব যত্ন নিয়েই পড়েছে। প্রথম পাতায় স্মরজিতের নাম লেখা, তলায় তারিখ বসানো। দু'বছর আগে কিনেছে বইখানা।

স্মরজিৎ আবার বললে, 'আমাদের দেশে সেক্স সম্বন্ধে কোনো এডুকেশনই তো হয় না—অথচ প্রত্যেক ছেলেমেয়ের শিক্ষার এটা অঙ্গ হওয়া উচিত।'

বিশাখা বোকার মতো বললো, 'এ-বিষয়ে আবার শেখবার কী আছে।'

'ঐ তো! তোমারও তা-ই ধারণা! পড়ো, পড়ো, তাহ'লেই বুঝবে কত শেখবার আছে। এ-সব না-পড়লে বিবাহিত জীবন সুখের হয় না।'

বই প'ড়ে বিবাহিত জীবনে সুখী হ'তে হয়, এ-খবর বিশাখার

কাছে নতুন। কিন্তু তর্ক করতে সে পারে না। সেদিন দুপুরবেলা স্মরজিৎ যখন স্ট্যুটের ট্রায়াল দিতে বেরিয়ে গেলো, তখন সে বইখানা নিয়ে বসলো। অর্ধেক কথারই মানে সে জানে না, কিন্তু একটু-একটু ব্যাপারটা যেন আঁচ করতে পারলো। যেখানে-যেখানে স্মরজিৎ দাগ দিয়েছে, সে-রকম দু-একটা জায়গা ভালো ক'রে বোঝবার চেষ্টা করলো। কী বুঝলো সে-ই জানে, হয়তো ভুলই বুঝলো, কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত মন-খারাপ হ'য়ে গেলো তার। এ-বই স্মরজিৎ দু-বছর আগে প'ড়ে ফেলেছে, হয়তো তার আগেও এ-ধরনের বই পড়েছে, এ-সব জ্ঞান কবে থেকে মনের মধ্যে বহন করছে সে ? বিশাখা উঠে তাড়াতাড়ি বাথরুমে গেলো, চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে শাড়িটা বদলে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো।

সে-রাত্রে স্মরজিৎ যখন তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে গেলো, সে ব'লে উঠলো, 'না, না—'

'কেন, কী হ'লো ?'

'ভালো লাগছে না আমার—' বিশাখা ছিটকে দূরে স'রে গেলো। কিন্তু শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে সে নিজেই হাত বাড়িয়ে স্বামীকে সজোরে চেপে ধরলো বুকের মধ্যে। স্মরজিৎ চোখ মেলে তাকালো, তারপর নিজেও উদ্বেল হ'লো, কিন্তু পরে, জানালায় ভোরের প্রথম আভা দেখতে-দেখতে বিশাখার আবার মন-খারাপ হ'য়ে গেলো। কেউ যেন তাকে কথা দিয়ে কথা

রাখেনি, তাকে ফাঁকি দিয়েছে, ঠকিয়েছে। পৃথিবীর সব কথাই কি বইয়ে লেখা আছে, পৃথিবীর সব জিনিশই আগে থেকে ঠিক হ'য়ে আছে—এমন-কিছু নেই যা ভাবা যায় না, জানা যায় না, যা হঠাৎ এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ডুবতে-ডুবতেও বোঝা যায় না যে ডুবছি?

স্মরজিতের যাবার দিন এসে পড়লো। এ-দু'বছর বিশাখা বাপের বাড়িতে থাকবে, এবং এ-দু'বছর সে কী ক'রে কাটাবে তার একটা খশড়াও স্মরজিৎ ক'রে ফেলেছে। পড়াশুনো করবে, নিজের পুরোনো বইগুলি ছাড়াও আরো অনেক নতুন বই সে স্ত্রীর জন্য কিনে এনেছে—তার মধ্যে বাংলা গল্পের বইও আছে কয়েকখানা। কিন্তু কোনো পরীক্ষা পাশ করতে না-হ'লে শুধু বই প'ড়ে সময় কাটানো শক্ত, তাই স্মরজিৎ ব্যবস্থা করলো যে বিশাখা ছবি আঁকাটা ভালো ক'রে শিখবে। তার বিবেচনায় ছবি আঁকায় হাত আছে বিশাখার। বিশাখা আপত্তি করেছিলো—আর তার ভালো লাগে না এ-সব—কিন্তু স্মরজিৎ তার কথা কানেই তুললো না, শ্বশুরের সঙ্গে কথা ব'লে সব ঠিক ক'রে ফেললো। গুপ্তর খুব উৎসাহ—তক্ষুনি ছবি আঁকার মাস্টার ঠিক ক'রে ফেললেন। বিশাখা এ-পর্যন্ত তিনজনের কাছে ছবি আঁকা শিখেছে, তার মধ্যে শেষ যিনি ছিলেন, সে-ভদ্রলোকের ছবির জগতে একটু নামই আছে, কিন্তু তাঁকে যখন রাখা হলো, তার দু'মাস পরেই বিয়ে হ'য়ে গেলো

ব'লে তাঁর কাছে কিছু শিখে নেবার সুযোগ বিশাখার বড়ো-একটা হয়নি। তাঁকেই আবার ডেকে আনা হ'লো, তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে স্মরজিৎও অপছন্দ করলো না। আগে তিনি সপ্তাহে দু'দিন আসতেন, এবার ঠিক হ'লো চার দিন ক'রে আসবেন —একটু ঘন-ঘন না-হ'লে কিছু শেখা হয় না—আগে গুপ্ত-সাহেব পঞ্চাশ টাকা ক'রে দিতেন, এবার দেবেন একশো ক'রে। অসীমবাবু রাজি হ'লেন—রং তুলি কাগজ আরো কী-কী দরকার তার একটা ফর্দ দিয়ে গুপ্তকে আর স্মরজিৎকে আলাদা-আলাদা নমস্কার ক'রে বিদায় নিলেন।

স্মরজিৎ পরের দিনেই রং তুলি ইত্যাদি নিয়ে এলো। শুধু তা-ই নয়, শ্বশুরকে ব'লে তেতলার ঘরটাকে ছবি আঁকার ঘর বানিয়ে নিলো সে। আগেকার মতো শাখা একতলায় ব'সে ছবি আঁকা শেখে, এ তার ইচ্ছা নয়। তেতলায় শখ ক'রে একটিমাত্র ছোটো ঘর করেছিলেন গুপ্ত—উত্তরটায় দেয়ালের বদলে ঘষা কাচ দিয়েছেন—কোনো-এক কালে এটি তাঁর স্ত্রীর ঠাকুরঘর হ'তে পারবে, সেই দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিলো। কিন্তু অমলা দেবীর মন এখনো ঠিক ঠাকুরঘরের দিকে যায়নি, ঘরটি তাই প্রায় ব্যবহারই হয় না, মাঝে-মাঝে ভোরবেলা গুপ্ত-সাহেব গিয়ে একটু বসেন, কি ছুটির দিনে ছেলেরা লাইন পেতে রেলগাড়ি চালায়। স্মরজিৎ বললে, 'কী সুন্দর নর্থ লাইট, স্টুডিওর পক্ষে একেবারে আইডিএল।' গুপ্ত তক্ষুনি উৎসাহে

টগবগ করতে-করতে ঘর থেকে ছেলেদের খেলা সব সরিয়ে দিলেন, ছোটো একটা পাখা বসালেন, দেয়াল ঘেঁষে সোফাও রাখলেন একটি—আঁকতে-আঁকতে ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম করবে। বিশাখা বিরক্ত হ'য়ে বললে, 'কী আরম্ভ করেছো তোমরা—কত যেন আমি ছবি আঁকবো।' স্মরিজৎ বললে, 'আঁকবে না কেন, নিশ্চয়ই আঁকবে—একদিন যে তুমি খুবই ভালো আঁকবে না, তা কি কেউ বলতে পারে?'

যাবার আগের দিন রাত্রে স্মরজিৎ স্ত্রীকে বললে, 'আমি চ'লে যাচ্ছি, কষ্ট হচ্ছে না তোমার?'

বিশাখা বললে, 'সেটা কি আমার মুখের কথায় শুনতে চাও?'

'আমারও খারাপ লাগছে খুব। যুদ্ধ না-থাকলে তোমাকে নিয়েই যেতাম।'

যুদ্ধ কথটা উচ্চারিত হ'তেই বিশাখা চকিত হ'লো। একটু পরে বললে, 'না-গেলে চলে না?'

'কোথায় না-গেলে?'

'বিলেতে।'

'কী যে বলো!' স্মরজিৎ হেসে উঠলো।

'তুমি যদি আই. সি. এস. না-হ'তে, অন্য-কিছু তো হ'তে।'

'তুমি কি আমাকে আই. সি. এস. ছেড়ে দিতে বলছো!' কথাটা স্মরজিৎ এমন ব্যঙ্গের সুরে বললো যে বিশাখা আর-কিছু বলবার সাহস পেলো না। মনটা উদাস হ'য়ে উঠলো

তার। সাত সমুদ্রের পরপারে কোথায় বিলেত! সেখান থেকে তার স্বামী মস্ত চাকুরে হ'য়ে আসবে—টাকা হবে, ক্ষমতা হবে, আরো টাকা, আরো ক্ষমতা, আরো, আরো, কিন্তু তারপর? তারপর? কী হবে টাকা দিয়ে? কী হবে ক্ষমতা দিয়ে? যে-টাকা আর যে-ক্ষমতা উপার্জনের জন্য এত চেষ্টা, সেটা যখন হাতে আসবে, তখন কী হবে? কী সেই অমূল্য রত্ন এত টাকা আর এত ক্ষমতা না-হ'লে যা কিছুতেই পাওয়া যেতো না?

স্মরজিৎ আবার বললে, এবার অনেকটা নরম সুরে, 'মন-খারাপ কোরো না, বোমার ভয় শুনতে যতটা লাগে আসলে ততটা নয়। আর প্রাণের ভয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দেবো, আমি কি এতই কাপুরুষ।'

বিশাখা বললে, 'সাবধান-মতো থেকো···কী আর বলবো।'

স্মরজিৎকে তুলে দিতে স্টেশনে গিয়ে বিশাখার দু'চোখ ছাপিয়ে জল এলো। বাড়ি এসে আর টি'কতে পারে না। কোন ছেলেবেলা থেকে ওর সঙ্গে চেনা—এতগুলি বছর ভ'রে এ-বাড়িতে ওর অবিরাম যাওয়া-আসা, আর আজ কোন দূর দেশে ও চ'লে গেলো, দু'বছরের মধ্যেও আর আসবে না। শুয়ে-শুয়ে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদলো বিশাখা, কাঁদবার পরে মন অনেকটা হালকা হ'লো।

পরের দিন সকালে উঠে এইটে ভেবে তার সবচেয়ে

খারাপ লাগলো যে তার কিছুই করবার নেই। বাবার স্নেহে, মা-র যত্নে, সরভাজা-পুডিং রোস্ট-কাবাব খেয়ে আর সপ্তাহে পাঁচটা সিনেমা দেখেই কি দিন কাটবে তার? অত্যন্ত অকৃতজ্ঞের মতো তার মনে হ'লো বিয়ের পরে স্বামী বিদেশে গেলে মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতেই থাকা উচিত—কিন্তু শ্বশুরবাড়িতেও তো মেয়েরা আজকাল বেকার, স্বামী আই. সি. এস. হ'লে তো আরো।

হঠাৎ তার মনে পড়লো পরশু থেকেই অসীমবাবুর তাকে ছবি আঁকা শেখাতে আসবার কথা। যাক, তবু একটা কাজ হ'লো—স্মরজিৎ এ-ব্যবস্থাটা খুব বুদ্ধি মানের মতোই করেছে। ছবি আঁকায় সে সত্যি মন দেবে এবার—স্বামীর আর বাবার এত উৎসাহ, এত আয়োজন একেবারেই যেন ব্যর্থ না হয়। ছ'দিন ব'সে-ব'সে দুটো স্কেচও ক'রে ফেললো দেখাবার জন্য।

অসীমবাবু এসে তাকে প্রথম কথা বললেন, 'যদিও তুমি একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী, তবু আমি তোমাকে তুমিই বলবো—ছাত্রীদের তুমি না-বললে আমার অসুবিধে লাগে।'

বিশাখা লজ্জিত হ'য়ে বললো, 'বাঃ, আপনি তো আগেও—'

অসীমবাবু তার কথায় বাধা দিলেন—'আগের সঙ্গে এখনকার তফাৎ হয়েছে ব'লেই কথাটা ব'লে নিলাম।'

বিশাখার স্কেচ দুটো দেখে অসীমবাবু কিছুই বললেন না। মাথা নিচু ক'রে পেনসিল দিয়ে নিজে একটা ড্রয়িং করতে

লাগলেন। হঠাৎ চোখ তুলে জিগেস করলেন, 'ছবি আঁকা তুমি কেন শিখছো?'

এ-প্রশ্নের কী-জবাব দেবে বিশাখা কিছুই ভেবে পেলো না। অসীমবাবু তার হ'য়ে জবাবটা দিলেন—'সময় কাটাতে?'

বিশাখা ভীরু গলায় জিগেস করলে, 'আমার কিছুই কি হবে না আপনার মনে হয়?'

'হওয়া বলতে কী বোঝো?'

অসীমবাবুর কথার সুরে আরো একটু ঘাবড়ে গেলো বিশাখা। চোখের দিকে না-তাকিয়ে বললে, 'ছবি আঁকা শিখতে কি পারবো আমি?'

'চেষ্টা করলেই পারবে', ব'লে অসীমবাবু আবার ড্রয়িং-এ মন দিলেন। সেদিন আর যতক্ষণ ছিলেন, একরকম চুপচাপই কাটলো। ভদ্রলোক স্বভাবতই স্বল্পভাষী। চলাফেরাও নিঃশব্দ। সপ্তাহে চার দিন নিয়মিত আসেন যান, বিশাখার আঁকার উপর দাগা বুলিয়ে দেন, মন্তব্য করেন না। বিশাখা ধ'রেই নেয় যে তার আঁকা খুব খারাপ হচ্ছে। খারাপ হচ্ছে—এ-কথাটাও তো উনি মুখ ফুটে বলতে পারেন।

একদিন বিশাখা ব'লেই ফেললো, 'আমি তো খুব চেষ্টা করি, ভালো হয় না কেন বুঝি না।'

'ভালো হয় না মানে?' অসীমবাবু এমনভাবে বিশাখার দিকে তাকালেন যেন সে বোকার মতো কিছু বলেছে। বিশাখা

নতমুখে নীরব হ'য়ে রইলো। অসীমবাবু আবার বললেন, 'কত আর ভালো হবে তুমি আশা করো ?'

তাহ'লে ভালো হচ্ছে! বিশাখার মন লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু অসীমবাবুর পরের কথাটা শুনেই দ'মে গেলো আবার।

'আরো একটা কথা আমার জিগেস করবার আছে। আমার কাছে তুমি--মানে তোমার অভিভাবকরা কী আশা করেন ?'

কী আশা করেন মানে ? বিশাখা ভিতরে-ভিতরে ঘেমে উঠলো। যেন তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরেই অসীমবাবু আবার বললেন, তাঁরা কি মনে করেন আমি তোমাকে শিল্পী বানাতে পারি ? না, পারি না। তোমাকে লাইন টানতে, রং লাগাতে শেখাতে পারি—তার বেশি আর-কিছু না, তার বেশি কেউ পারে না। কিন্তু রঙে-রেখায় তো ছবি হয় না, ছবি হয় মনে। সেই মন তোমাকে কেউ দিতে পারে না, সেটা তোমার থাকা চাই। তুমি কি ভেবে দেখেছো সে-মন তোমার আছে কিনা ?'

কথা শেষ ক'রে অসীমবাবু বিশাখার দিকে তাকালেন। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলো বিশাখা। এ-ধরনের কথা কোনোদিন শোনেনি সে, এ থেকে সে কী বুঝবে, কী ভাববে তা-ই সে জানে না। আর উনি এমন ক'রে তাকান যেন ভিতরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, চোখের সামনে পড়লে চোখ নামিয়ে নিতে হয়।

'আমার কথা কি তুমি শুনেছো ?'

বিশাখা মাথা নেড়ে সায় জানালো। অসীমবাবু যেন তার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্য একটু অপেক্ষা করলেন, কিন্তু বিশাখা চুপ ক'রেই রইলো, তিনিও আর কিছু বললেন না।

বিয়ের আগে বিশাখা যখন এঁর কাছে শিখেছে, তখন মানুষটিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করেনি। তখন আধ-ডজন মাস্টার-মাস্টারনির মধ্যে ইনিও যেতেন আসতেন, কোনোরকমে ঘণ্টাখানেক চুপচাপ ব'সে থাকতে পারলেই হ'য়ে যেতো, আর কিছু করবার বা ভাববার ছিলো না। যে-বিয়ে হবার জন্য এত সব, সে-বিয়েই তো আর-ক'দিন পরে তার হবে—কী হবে আর এ-সব দিয়ে ?

এবারে তাই অসীমবাবুকে দেখতে-দেখতে সে অবাক হ'তে থাকলো। ছেলেবেলা থেকে যে-সব মানুষ সে দেখে আসছে, তাদের আত্মীয়, স্মরজিতের আত্মীয়, বাবার বন্ধু-বান্ধব—তাদের কারুর মতোই নন ইনি। অথচ কেন যে নন, কিসে যে ইনি স্বতন্ত্র, তাও বিশাখা বোঝে না। শুধু মনে হয়, তাঁকে যে-রকম দেখায় আসলে তিনি সে-রকম নন—সত্যি-মানুষটিকে মার্জিত ব্যবহারের তলায় ইনি চাপা দিয়েছেন, যে-মানুষ হঠাৎ কখনো ভেসে ওঠে তাঁর চোখের তীব্র দৃষ্টিতে। তাঁর চেহারা, তাঁর ভাব-ভঙ্গি, তাঁর কথাবার্তা—সবই শান্ত, গম্ভীর ও প্রৌঢ়জনোচিত, তাঁর বয়স চল্লিশ বললেও অবিশ্বাস

হয় না, যদিও ভালো ক'রে মুখের দিকে তাকালে (সে-রকমভাবে একবার দু'বারই বিশাখা তাকিয়েছে) সন্দেহ হয় যে ভদ্রলোক এখনো হয়তো তিরিশের তলাতেই। বিশাখা শুনেছিলো যে ছবির ট্যুশনি করাই তাঁর প্রধান উপজীবিকা : দেখতে গুরুগম্ভীর হ'লে ট্যুশনি পাওয়া সহজ হয় ব'লেই কি ও-রকম চেহারা করেছেন ? যা-ই হোক, ওটা যে তাঁর একটা আচ্ছাদন এ-কথা বিশাখার প্রায়ই মনে হয়। ওর তলায় যাকে তিনি চাপা দিয়ে রেখেছেন—সে, আর যা-ই হোক, অন্যরকম। সেই অন্তরালবর্তীর কথা ভাবতে বিশাখার ভালো লাগে, আবার ভয় করে।

অসীমবাবু আসেন বেলা দশটায়। আরো সকালে আসতে তাঁর আপত্তি ছিলো না, বিশাখা দেরিতে ওঠে ব'লেই এই ব্যবস্থা। আটটার আগে ঘুম ভাঙে না তার। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই এক পেয়ালা চা আর একটি ডিম খায়, তারপর হাত-মুখ ধুয়ে রেফ্রিজেরটরে ঠাণ্ডা-করা কিছু ফল-মিষ্টি খেয়ে নাইতে যায়। স্নান করতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগে তার। যতদিন স্কুলে যেতো, ও-পাটটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতো হ'তো, স্কুল ছাড়বার পরেও আগের অভ্যেসই র'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এখন সে স্নানের আরামটি পুরোপুরি ভোগ করে, স্নানের ঘরে থরে-থরে সাজানো বিলাসদ্রব্যের কোনোটিরই সদ্ব্যবহার করতে ভোলে না। শুভ্র, স্নিগ্ধ, সুগন্ধ হ'য়ে একটি হালকা রঙের শাড়ি

প'রে সে বেরিয়ে আসে, তারপর এক গ্লাশ বাড়ির তৈরি ঘোল খেয়ে দশটার কয়েক মিনিট আগে তেতলায় স্টুডিওতে যায়। আবাল্য এ-বাড়িতে কাটালো, কিন্তু তেতলার এই ঘরটি এতদিন অজানাই ছিলো। মাত্র কয়েকটা সিঁড়ির ব্যবধানে পৃথিবীর চেহারায় যে এত বদল হ'তে পারে, কে জানতো! এলেই বিশাখার মনে হয় সে যেন অন্য-কোথাও এসেছে, অন্য-কোনো দেশে। যেখানে সে বসে, সেখান থেকে চোখে পড়ে শুধু মস্ত আকাশ, আর আকাশে শাদা মেঘ, আর মেঘের কাছাকাছি দু'একটি কালো পাখি। এদের নিয়েও আর-একটা জগৎ আছে। কলকাতার শহরে যেমন সারাদিন ধ'রে কত কিছু হচ্ছে, ওখানেও তা-ই। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ মনে পড়ে সেই যে একদিন সন্ধ্যায় সে কেঁদেছিলো। সে-কান্না এসেছিলো ঐ আকাশ থেকেই, আকাশ যেন ও-কথা জানে। তারপর স্মরজিতের কথা মনে পড়ে। ঠিক দুঃখ নয়, বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ অনুভূতি নয়, বুকের মধ্যে কেমন-একটা ভার। মন যেন ভরা-ভরা। অসীমবাবু যে-মনের কথা বলেছিলেন, এ কি তার সেই মন? সে-মন কি তার আছে?

ঠিক দশটার সময় অসীমবাবু আসেন। বাইরে জুতো রেখে মার্বেল-মেঝের উপর বসেন দরজার দিকে পিঠ দিয়ে, এক মিনিট সময় নষ্ট না-ক'রে কাজ আরম্ভ করেন। নিজে কাজ ক'রে ছাত্রীকে শেখানো বোধহয় তাঁর পদ্ধতি। স্কেচ করেন, ড্রয়িং

করেন, রং মেশান, রং লাগান—বিশাখা ব'সে-ব'সে চুপ ক'রে ছাখে। শাদা কাগজ দেখতে-দেখতে গাছে-পালায় মানুষে-পশুতে বিষাদে-খুশিতে ভ'রে ওঠে। ছবির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর আঙুলও ছাখে বিশাখা, হাতটি ভারি নরম মনে হয়। পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিটে এক-একটি ছবি শেষ ক'রে সরিয়ে রাখেন—বিশাখা বুঝতে পারে না কেন সেগুলো 'ভালো' ছবি নয়, কেন সেগুলো অনাদরে ফেলে দেন উনি।

যেতে-যেতে সাড়ে-এগারোটা হয়, কোনোদিন বারোটা। এই সময়টায় গুপ্ত-সাহেব যান আপিশে, ছেলেরা যায় স্কুলে, অমলা দেবী সংসারের তদারক শেষ ক'রে নিজে স্নান সেরে নেন। স্টুডিওতে কেউ আসে না, বাড়ির কোনো আওয়াজ পৌঁছয় না সেখানে, বাড়িটা যে আছে সে-কথাই বিশাখা ভুলে থাকে মাঝে-মাঝে। নিচে যখন নামে, মনে হয় যেন বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরলো। ভারি আরাম লাগে। প্রথমেই খাটে খানিকক্ষণ শুয়ে নেয়, তারপর মা-র সঙ্গে ব'সে গল্প করতে-করতে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাত খায়।

এই আরামের নেশা তার এমন হ'লো যে সপ্তাহের যে-তিন দিন অসীমবাবু আসেন না, সে-তিন দিনও সকালের ঐ নির্দিষ্ট দু'ঘণ্টা সে স্টুডিওতে কাটাতে লাগলো। অসীমবাবু যেখানে বসেন, ঠিক সেখানটাতে ব'সে ছবি আঁকে, আঙুলের ঠিক ঐ-রকম ভঙ্গি, মুখের ঠিক ঐ-রকম ভাব আনবার চেষ্টা

করে, কিন্তু নিজেই বুঝতে পারে যে ছবি তার কিছুই হয় না। ব'সে থেকে-থেকে কেবলই তার মনে হয় এই বুঝি অসীমবাবু তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। এত নিঃশব্দে আসেন তিনি, এলেও তো টের পাবে না বার-বার পিছনে তাকায়, কিন্তু না। আসবেনই বা কেন, আজ তো তাঁর তারিখ নয়। কিন্তু ভুল কি হ'তে প্যারে না কোনোদিন ? শুক্কুরবারের বদলে বেস্পতিবার এসে পড়তে পারেন না ? না, ভুল অসীমবাবুর হয় না, কোনোদিন না।

একদিন অসীমবাবু জিগেস করলেন, 'মিস্টর দাসের কোনো চিঠি পেয়েছো ?' বিশাখা বুঝতে না-পেরে তাকিয়ে রইলো।

'তোমার স্বামীর কথা বলছি।'

'ও!' ব'লেই একটু যেন লজ্জিত হ'য়ে বিশাখা বললে, 'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

গেলো সপ্তাহে স্মরজিতের অনেকগুলো চিঠি এসেছে একসঙ্গে। লণ্ডনে পৌঁছিয়েই হাওয়াই ডাকে যা ছেড়েছে, আর পথে-পথে বিভিন্ন বন্দরে জল-ডাকে যেগুলি পাঠিয়েছিলো, সব প্রায় একই সময়ে এসে পৌঁছলো। সব সুদ্ধু সাতখানা চিঠি, চারখানা স্ত্রীকে, আর তিনখানা শ্বশুরকে। দেশ ছাড়বার দু'মাস পরে এই তার প্রথম খবর। বিশাখা প্রথমে নিজের গুলি পড়লো, তারপর বাবার ক'খানা, তারপর তারিখ মিলিয়ে-মিলিয়ে পর-পর সাতখানা আরো একবার। বাবার

চিঠিগুলোই তার বেশি ভালো লাগলো, তার কারণ বোধহয় এই যে সেগুলি ইংরেজিতে লেখা—বাংলার চাইতে ইংরেজিটাই স্মরজিৎ লেখে ভালো। বিলেতে পা দিয়েই যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডের বর্ণনা এমন সুন্দর ক'রে লিখেছে যে সেন্সর একটি আঁচড়ও কাটতে পারেনি। ওখানকার বোমা-নিবারক ব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন অনেক খবরই পাওয়া গেলো, য়্যাতে বেশ আশ্বস্ত হওয়া যায়; এ-রকম কোনো খবরই পেলো না যাতে উতলা হ'তে হয়। তাকে ছেড়ে গিয়ে স্মরজিতের ভালো লাগছে না, কোনো-না-কোনো কথা থেকে এ-খবরটি মুচড়িয়ে বের করবার চেষ্টা বিশাখার বিফল হ'লো। সে বেশ ভালোই আছে—শাখাও যেন ভালো থাকে, স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়, পড়াশুনো করে, ছবি আঁকায় মন দেয়।

'ভালো আছেন তিনি ? অসীবাবু জিগেস করলেন।

'হ্যাঁ ভালো আছেন। আমাকে মন দিয়ে ছবি আঁকতে বলেছেন।'

'তাহ'লে মন দেয়া যাক।' অসীমবাবু এক কর্তব্য সমাপন ক'রে আর-এক কর্তব্যে নিযুক্ত হলেন। হঠাৎ বিশাখার মনে হ'লো যে ইনি তো তার সম্পূর্ণ পরিচয় জানেন—তার বাবা, মা, স্বামী সকলকেই চেনেন, অথচ সপ্তাহে এই আট ঘণ্টার বাইরে তার কাছে তো এঁর অস্তিত্বই নেই। ইনি কোথায় থাকেন, বাড়িতে কে-কে আছেন, এঁর স্ত্রী কেমন,

বন্ধুবান্ধব কারা,—এ-সব কিছুই জানে না সে। ছবি-আঁকা ছাড়া অন্য-কোনো বিষয়ে ইনি কখনোই কথা বলেন না, তাঁর ভাবখানা এই রকম যেন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তিনি একাই আছেন, তাঁর আশে-পাশে আর-কেউ নেই, আর-কিছু নেই। বিশাখা মনে-মনে ভেবে দেখলো, ভদ্রলোক অত্যন্ত দাম্ভিক।

এর পরে অসীমবাবুর যেদিন আসবার কথা, বেলা ন'টা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠলো। গুপ্ত-সাহেব ধরলেন। একটু পরে মেয়েকে এসে বললেন, 'অসীমবাবু আজ আসতে পারবেন না, তাঁর বাড়িতে অসুখ।'

বিশাখা সচকিত হ'য়ে বললো, 'উনি নিজেই ফোন করছিলেন ?'

গুপ্ত বললেন, 'অসুখ-বিসুখ খুব হচ্ছে আজকাল। শীত প'ড়ে এলো—তবু বিরাম নেই। শহরটা কী-যে হচ্ছে দিন দিন !'

'আমাকে একটু ডেকে দিলেই পারতে, বাবা !'

'তোর কথা কিছু তো বললেন না। আজকের কামাইটা কাল এসে পুষিয়ে দেবেন, বললেন। লোকটি খুব অনেস্ট —ফাঁকি-টাকির ধার ধারেন না।'

ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে বিশাখা বললো, 'আহা—একদিন আসবেন না—তার জন্য আবার—'

গুপ্ত বললেন, 'না, না—একদিন আসা-না-আসার কথা নয়—কিন্তু এইটেই হচ্ছে ক্যারেক্টর, এতে মানুষ চেনা যায়।' গুপ্তর

অধীনে যে-হাজারখানেক লোক কাজ করে তাদের মধ্যে এই 'ক্যারেক্টরে'র অভাব প্রায়ই তিনি লক্ষ্য করেন, তাই কোথাও তার সন্ধান পেলে খুশি হ'য়ে ওঠা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

একটু চুপ ক'রে থেকে বিশাখা বললে, 'ওঁকে একটা টেলিফোন করলে হ'তো। কার অসুখ, কী হয়েছে—'

গুপ্ত হেসে বললেন, 'ওঁর কি আর বাড়িতে টেলিফোন আছে!'

'ওঁর ঠিকানাটা জানো, বাবা?

'ভবানীপুরের দিকে কোথায় থাকে যেন—কিন্তু ঠিকানা তো জানি না। কেন রে, মাস্টার মশাইর উপর তোর খুব দরদ হয়েছে দেখছি।'

'আমি ভাবছিলাম ওঁকে একদিন খেতে বললে হয়।'

'বেশ তো! নিশ্চয়ই! তোর যেদিন ইচ্ছে বল।—দাঁড়া, আমি কবে ফ্রী আছি দেখে নিই—' গুপ্ত পকেট থেকে নোটবই বের ক'রে পাতা ওল্টাতে লাগলেন—'রাত্তিরে বলবি, না চায়ে?' মেয়ের জবাবের অপেক্ষা না-ক'রে নিজেই বললেন, 'ওকে আর রাত্তিরে ব'লে কী হবে—চায়েই বল—কী মুশকিল একটা বিকেলও যে খালি পাচ্ছি না—দাঁড়া, দাঁড়া—এই যে, এই সোমবারটা—হ্যাঁ, সামনের সোমবার বিকেলটা খালি আছে—রাত্তিরে আবার সতীশ বাঁড়ুয্যের মেয়ের বিয়ে। তাহ'লে সোমবারে ওঁকে ব'লে দিস—তোর মা-ই বলবেন'খন—আমিও

এটা লিখে নিচ্ছি—নয়তো ভুলে গিয়ে অন্য কোথাও হয়তো চায়ের নেমন্তন্ন নিয়ে ফেলবো—এনগেজমেণ্টর যা ভিড় আজকাল!' নোটবই পকেটে ফিরিয়ে রেখে গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন।—'ঠিক আছে?'

বিশাখা মাথা নাড়লো।

'ভালোই হ'লো। লোকটির সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করবার আমারও ইচ্ছা ছিলো। আর্টিস্টদের আমার ভালোই লাগে।'

পরের দিন অসীবাবু এলেন একটু দেরি ক'রে। ঐ একটু দেরি, আর চোখের একটু লাল ভাব—এ ছাড়া সবই অন্য দিনের মতো। এসেই বিনা বাক্যব্যয়ে কাজে বসলেন। একটু উশখুশ ক'রে বিশাখা বললে, 'আপনার বাড়ির অসুখ কেমন আছে?'

অসীমবাবু এমন ক'রে তাকালেন যে বিশাখা অপরাধীর মতো সংকুচিত হ'য়ে গেলো। এ ভারি অন্যায় কিন্তু—অত্যন্ত সহজ, সাধারণ প্রশ্নের উত্তরে এইরকম ক'রে তাকানো।

'একটু ভালো।'

বিশাখা একবার ঢোঁক গিলে বললো, 'কার অসুখ?'

'আমার বোনের।'

এই সামান্য কথাটুকুতে বিশাখা মনে-মনে উল্লসিত হ'লো। অসীমবাবুর যে বোন আছে, আর সে-বোনের যে অসুখ করে

এ যেন বিশাখার মস্ত জিৎ। এবার অনেকটা নির্ভয়ে সে এর পরের অনিবার্য প্রশ্নটি করলে, 'কী অসুখ ?'

'জ্বর হচ্ছে। কী অসুখ বলতে হ'লে ডাক্তার হ'তে হয়।'

অকারণে এমন তিরস্কার বিশাখা কখনো শোনেনি—কারণেও না। ভেবেছিলো এর পরে জিগেস করবে, 'আপনার ভাই-বোন ক'টি ?' কিন্তু লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারলো না। অথচ লজ্জাই বা কিসের—সে তো কোনো অন্যায় করেনি, অন্যায়টা অসীমবাবুরই, এমন-কী মহাপুরুষ তিনি যে সাধারণ লোকের সঙ্গে সাধারণভাবে কথা কইতে পারেন না। তিনি যদি রোগীর পরিচর্যায় রাত জেগে থাকেন, আর আজ যদি তাঁর মেজাজ বিগড়ে থাকে, সে তো তার দোষ নয়—কালকের কামাইয়ের খেশারৎস্বরূপ আজ কেউ তাঁকে আসতেও বলেনি।

যাবার সময় সিড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বিশাখা বললে, 'মা-র সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবেন। তিনি কী বলবেন আপনাকে।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ, আপনাকে,' একটু চেষ্টা ক'রে বিশাখা বললো। সিঁড়ির তলায় মা-কে দেখতে পেয়েই ব'লে উঠলো, 'মা, এঁকে তুমি কী বলবে বলেছিলে ?'

চায়ের নিমন্ত্রণের কথা অমলা দেবী ভুলেই গিয়েছিলেন,

মেয়ের কথায় মনে পড়লো। মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বললেন, 'সোমবার বিকেলে আপনি এখানে এসে চা খাবেন।'

কথাটা শুনেই অসীমবাবু একবার বিশাখার দিকে তাকালেন। বিশাখার মনে হ'লো তাঁর চোখে এতক্ষণ যেটা লাল আভাস্মাত্র ছিলো সেটা সমস্ত শাদা অংশে ছড়িয়ে পড়লো নিমেষে। তাড়াতাড়ি বললে, 'বাবার খুব ইচ্ছে আপনি সোমবার এসে আমাদের সঙ্গে চা খান—আসবেন নিশ্চয়ই?'

একটু চুপ ক'রে থেকে অসীমবাবু বললেন, 'আসবো। কখন আসতে হবে?'

অমলা দেবী বললেন, 'এই পাঁচটা—ছ'টা—যখন আপনার সুবিধে—'

বিশাখা বললেন, 'ঠিক পাঁচটাতেই আসবেন আপনি।'

'আচ্ছা।'

অসীমবাবু চ'লে যেতেই বিশাখা বললে, 'মা, অমন কাঠ-কাঠ ক'রে বললে কেন কথাটা?'

'কাঠ-কাঠ আবার কোথায় হ'লো?' অমলা দেবী অবাক হলেন।

'না-হয় তোমার মেয়ের মাস্টারিই করেন, একজন গুণী লোক তো।' ব'লেই বিশাখা হাসলো, যেন জানাতে চায় কথাটা ঠাট্টা ক'রে বলা।

'হয়েছে, আমার উপর আর সর্দারি করতে হবে না', অমলা দেবীও হাসলেন। কিন্তু বিশাখার মনে কিসের একটা খোঁচা যেন লেগে রইলো সারা দিন।

রবিবার দুপুরে সবাই একসঙ্গে খেতে ব'সে বাবাকে সে একবার মনে করিয়ে দিলে, 'বাবা, কাল কিন্তু অসীমবাবুকে চায়ে বলেছো।'

'মনে আছে আমার।' স্ত্রী দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভালো ক'রে একটু ব্যবস্থা কোরো—ওর কথা অনেকেই জানে, দেখলাম।'

বিশাখা প্রশ্ন-ভরা চোখে বাবার দিকে তাকালো।

'কাল গিয়েছিলুম সুরবন্ধু সরকারের বাড়ি—তাঁর ছবির খুব ভালো কলেকশন, জানিস তো। হঠাৎ একটি ছবির গায়ে নাম-সইটা আমার চোখে পড়লো—সে-ছবি আগেও দেখেছি তাঁর বাড়িতে। জিগেস করলুম, "এই অসীম মিত্রকে চেনেন?" তিনি যা বললেন তাতে বোঝা গেলো এ আমাদেরই অসীম। অনেক খবর পাওয়া গেলো ওর সম্বন্ধে।'

খবরগুলো যে সে-ও জানতে চায় তা কী-ভাবে জানাবে বুঝতে না-পেরে বিশাখা মিছিমিছি এক ঢোঁক জল খেলো। কিন্তু গুপ্তকে প্রশ্ন করতে হ'লো না, নিজেই বলতে লাগলেন, 'সুরবন্ধুবাবু অসীমকে ছেলেবেলা থেকেই চেনেন—ওর বাবা তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর মতে আমাদের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে অসীমই সবচেয়ে প্রমিসিং—'

বিশাখা হেসে উঠে বললে, ‘উনি এখনো যদি তরুণ থাকেন তাহ’লে আর—’

‘তরুণ বইকি !’ সরকারের মুখের একটা কথা গুপ্ত-সাহেব গম্ভীরভাবে নিজের ব’লে চালিয়ে দিলেন, ‘শিল্পীর জীবন তো পঞ্চাশেই আরম্ভ, তার আগে শুধু প্রস্তুত হওয়া। শিল্পীর পক্ষে সাতাশ আর বয়স কী !’

বিশাখা মৃদুস্বরে বললে, ‘দেখতে কিন্তু ওঁকে তিরিশেরও বেশি লাগে।’

‘তা লাগে বইকি, তার কারণও আছে। ওর বাবা দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে-ভুগে মারা যান—কিছু রেখে যেতে পারেননি ভদ্রলোক—আর সেই থেকে সমস্ত সংসারের ভার ওরই উপর পড়েছে। মা, বিধবা পিসিমা—অনেকগুলি ছোটো-ছোটো ভাই-বোন—’

‘কী ক’রে চালায় ?’ টেবিলের দূর প্রান্ত থেকে অমলা দেবী জিগেস করলেন।

‘চালায় এই ট্যুশনি ক’রে—আর ছবি বেচে। তবে আমাদের দেশে কে-ই বা কেনে ছবি—ও দিয়ে অত বড়ো সংসার চালানো কি সোজা !’

‘চাকরি কেন করে না ?’ অমলা দেবীর দ্বিতীয় প্রশ্ন।

‘চাকরি করলেই বা হাতি-ঘোড়া কী পাবে—সাধারণ বি. এ. পাশ ছেলের মাসিক মূল্য তো ষাট টাকা।’

'উনি চাকরি করতে যাবেন কোন দুঃখে! যে-বিদ্যে ওঁর জানা আছে, তা-ই দিয়েই রাশি-রাশি অর্থ উপার্জন করবেন একদিন।' নিজের কণ্ঠস্বরের উষ্ণতায় বিশাখা নিজেই অবাক হ'লো। পরমুহূর্তে অনেকটা সহজভাবে বললে, 'এমন-কিছু কষ্টে আছেন ব'লে তো মনে হয় না ওঁকে দেখে। রোজ একেবারে পাট-ভাঙা ধবধবে জামা-কাপড় প'রে আসেন, এতদিনের মধ্যে একদিন দেখিনি আধ-ময়লা কাপড় পরতে।'

গুপ্ত হেসে বললেন, 'আজকাল কি জামা-কাপড় দেখে আর্থিক অবস্থা বোঝা যায়! লক্ষপতিও ছিটের হাফ-শার্ট প'রে ঘুরে বেড়ায় আর দু'বেলা যার খাওয়া জোটে না, সে-ও সেজে-গুজে ফুল-বাবু হ'য়ে বেরোয়।'

'পুরুষের ভারি মুশকিল কিন্তু! সব ভদ্রলোকেরই কাপড়চোপড় প্রায় একই রকম। লক্ষপতি হ'লেও তো আর সোনার জামা পরে না।' ব'লে অমলা দেবী একটু হাসলেন।

'অতগুলো হাঁ ভরাতে নিশ্চয়ই বেগ পেতে হয় ওকে। তাও ভাগ্যিশ বিয়ে করেনি!—চাটনিটা আর-একটু দাও তো।'

স্বামীর দিকে চাটনির পাত্রটি ঠেলে দিয়ে অমলা দেবী বললেন, 'কী আর হ'তো বিয়ে করলে—ওরই সঙ্গে চ'লে যেতো।'

'না—না—বিয়ে করলেই দায়িত্ব, ছেলেপুলে, সামাজিকতা—পঞ্চাশ রকমের ঠেলা। আশা করি অবস্থা একটু ভালো করতে পারার আগে বিয়ে করার দুর্মতি ওর হবে না।'

অমলা দেবী ব'লে ফেললেন, 'বাপের ছেলেপুলের দায়িত্বের চাইতে নিজের ছেলেপুলের দায়িত্বই তবু ভালো।'

পনেরো থেকে আট পর্যন্ত বয়সের চার-চারটি ছেলের দিকে তাকিয়ে গুপ্ত একবার কাশলেন, তারপর অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'যা-ই হোক, যুদ্ধ ক'রে টি'কে আছে তো কলকাতার শহরে। সুরবন্ধুবাবু বলছিলেন, সেদিন একটা এগজিবিশনে আড়ই-শো টাকায় একখানা ছবি বিক্রি হয়েছে ওর—' একটু চুপ ক'রে, যেন মনে-মনে একটা হিশেব ক'রে নিয়ে বললেন, 'একখানা ছবি যার আড়াই-শো টাকায় বিক্রি হয়, তাকে তো নেহাৎ ফ্যালনা আর্টিস্ট বলা যায় না।'

'বছরে ক'খানা ছবি বিক্রি হয়?' অমলা দেবী জানতে চাইলেন।

'তার কি কিছু ঠিক আছে। এই ক'রে-ক'রেই হয় আস্তে-আস্তে। আপাতত শাখার ট্যুশনিটা পেয়ে ওর একটু সুবিধেই হয়েছে বোধহয়—মাসে বাঁধা একশো টাকা তো চট ক'রে আসে না।'

কথা শেষ ক'রে গুপ্ত মেয়ের দিকে তাকালেন, কিন্তু বিশাখার চোখ আনত। মা-বাবার আলোচনা তার এত খারাপ লাগছিলো যে ভালো ক'রে খেতেই পারলো না সে। অথচ ছেলেবেলা থেকে ওঁদের মুখে এই রকম কথাই সে শুনে আসছে চিরকাল—কখনো মনে কিছু লাগেনি। আজ এত খারাপ কেন লাগলো

তার কারণটা নিজেকে সে জিগেস করলো না, শুধু তীব্র প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করলো, ঝাঁঝিয়ে উঠে কিছু বলতে ইচ্ছা করলো—কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ তা বুঝতে পারলো না, প্রতিবাদের ভাষাও খুঁজে পেলো না। নিজের ঘরে আবদ্ধ হ'য়ে একা-একা কাটালো সারা দুপুর।

সোমবারে অসীমবাবু যখন এলেন, গুপ্ত তখনো আপিশ থেকে ফেরেননি। অমলা দেবী চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত, বিশাখা তাকে অভ্যর্থনা ক'রে ড্রয়িংরুমে এনে বসালো। এই ঘরে বিশাখা অনেকটা সহজ বোধ করলো, হাসিমুখে বললে, 'আমার এমন ভয় হচ্ছিলো আপনি না ভুলে যান।'

ক্ষীণ হেসে অসীমবাবু বললেন, 'ভুলে তো যাই-ই নি, বরং একটু আগেই যেন এসে পড়েছি মনে হচ্ছে।'

'না, না, আগে আর কী—ঠিক সময়েই তো এসেছেন—'

'মিস্টর গুপ্ত এখনো আপিশ থেকে ফেরেননি বুঝি?' অসীমবাবু অত্যন্ত কোমল স্বরে বললেন, কিন্তু বিশাখাকে কথাটা বিঁধলো। চারটে থেকে প্রস্তুত হ'য়ে সে ঘন-ঘন এ-জানলায় ও-জানলায় তাকাচ্ছিলো, পাছে উনি এসে কাউকে দেখতে না-পেয়ে অপ্রস্তুত হন। আর বাবা বাড়ি নেই ব'লে ওঁর আসাটাই ব্যর্থ হ'য়ে গেলো!

'আজকের উপলক্ষ্যটা কী?'

'উপলক্ষ্য কিছুই নয়, আর-কেউ আসবেও না, আর আপাতত

আমার একলার সঙ্গই আপনকে সহ্য করতে হবে,' বলতে-বলতে বিশাখার মুখ গরম হ'য়ে উঠলো।

অসীমবাবু বিশাখার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলেন।

গলার স্বর বদলে বিশাখা বললে, 'আপনার বোন কেমন আছেন ?'

এ-প্রশ্নের অসীমবাবু কোনো জবাব দিলেন না।

বিশাখা আবার বললে, 'সেদিন আসতে পারেননি, তাই আবার পরের দিন এলেন। আপনি বুঝি কোনো কারণেই কর্তব্যে ত্রুটি হ'তে দেন না ?'

'সে-জন্যে নয়। ভালো লাগে ব'লেই আসি।' বিশাখা সচকিত হ'য়ে চোখ তুলতেই অসীমবাবু আবার বললেন, 'তেতলার স্টুডিওটি বেশ।'

লম্বা পা ফেলে গুপ্ত-সাহেব ঢুকলেন ঘরে।—'এই যে, নমস্কার। কতক্ষণ ? খুব ভালো হ'লো—অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে আপনার সঙ্গে আর্ট নিয়ে একটু আলাপ করি। বসুন—আসছি এক্ষুনি।'

আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে আপিশের কাপড় ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে গুপ্ত-সাহেব ড্রয়িংরুমে এসে গদিয়ান হলেন। একটু পরে অমলা দেবী এসে জানালেন চা দেয়া হয়েছে।

'এখানেই আনতে বলো না—অসীমবাবুর সঙ্গে গল্প

করতে-করতে বেশ ঘরোয়াভাবেই খাওয়া যাক।' কিন্তু অমলা দেবী এমনভাবে চুপ ক'রে রইলেন যে গুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ও, খাবার ঘরেই ব্যবস্থা করেছো বুঝি? বেশ। অসীমবাবু, আসুন।'

টেবিলের মাথায় বসলেন গুপ্ত, তাঁর ডান দিকে অমলা দেবী, বাঁ দিকে অসীমবাবু; অসীমবাবুর পাশে বিশাখা। গুপ্ত অবিশ্রান্ত কথা বলতে লাগলেন, অসীমবাবু মাঝে-মাঝে, মা-মেয়ে নীরব। অসীমবাবুর কণ্ঠস্বর এতই নিচু যে গুপ্তকে যে-সব কথা তিনি বলছিলেন, পাশে ব'সেও বিশাখা অনেক সময় তা শুনতে পাচ্ছিলো না। খেতে-খেতে সে দেখতে লাগলো অসীমবাবুর খাওয়া—ছবি আঁকার মতোই কোমল ভঙ্গিতে তিনি চায়ের পেয়ালা মুখে তুলছেন, আর হাতের পাতাটি কী টুকটুকে লাল, কোনো পুরুষমানুষের অমন সে দ্যাখেনি, কোনো মেয়েরও না। এমন নিঃশব্দে খান তিনি—ডালমুট খেতেও আওয়াজ হয় না—সেইজন্য বোধহয় চোখেও পড়ে না তাঁর খাওয়া। গুপ্ত-সাহেব বার-বার বলতে লাগলেন—'আর-একটু নিন, অসীমবাবু, আর-একটু নিন—ভালো ক'রে খান, বেশি ক'রে খান।'

অসীমবাবু একবার বললেন, 'বেশি ক'রে খাওয়ার জন্য আমাকেই নির্বাচন করলেন?'

'আপনি অতিথি—আপনি ভালো ক'রে খেলেই আমাদের তৃপ্তি। অবশ্য আমি নিজেও—' গুপ্ত-সাহেব হাত বাড়িয়ে

আর-একটি ডিমের শিঙাড়া নিলেন। 'বেশ করেছে এগুলো—কী বলেন?'

'খুব ভালো হয়েছে', ব'লে অসীমবাবু শিঙাড়ার থালাটি বিশাখার সামনে ধ'রে বললে, 'তুমি তো কিছুই খাচ্ছো না, বিশাখা।'

অসীমবাবুর মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে বিশাখা এই প্রথম শুনলো। নিমেষে একটা শিরশিরানি ব'য়ে গেলো তার মেরুদণ্ডে।

'নাও একটা—'

অসীমবাবুর চোখ থেকে দৃষ্টির হলকা যেন বিশাখার মুখে লাগলো। মাথা নিচু ক'রে বললে, 'না, আর না।'

অসীমবাবু আর পিড়াপিড়ি না-ক'রে অমলা দেবীর দিকে থালাটি বাড়িয়ে বললেন, 'আপনি আর-একটা নিন, মিসেস গুপ্ত।'

অমলা দেবী এতক্ষণ পরিবেশনেই ব্যস্ত ছিলেন, এইমাত্র নিজে খেতে আরম্ভ করেছিলেন। মৃদু হেসে নিলেন শিঙাড়া।

গুপ্ত হঠাৎ বললেন, 'শিল্পীদের জীবনের সমস্যার কী-ভাবে সমাধান হ'তে পারে আপনার মনে হয়?'

'জীবনের সমস্যা মানে?'

'মানে—তাঁরা কী-ভাবে বাঁচবেন—'

'কেন বাঁচবেন, কেমন ক'রে বাঁচবেন, না কী নিয়ে বাঁচবেন?'

'না, না—আমি ভাবছিলুম শিল্পীদের খাওয়া-পরা ঘর-সংসারের ব্যবস্থা কী-রকম হবে—কতখানি সময় তাঁরা দেবেন ও-দিকে, আর ও-সব করতে গিয়ে কতটা ক্ষতি হবে তাঁদের। এই ধরুন—আমরা সাধারণ মানুষ—চাকরি করছি, সংসার করছি, আড্ডা দিচ্ছি কোনো ভাবনাই নেই আমাদের, কিন্তু শিল্পীদের কথা আলাদা।'

'ও, আপনি জীবিকার কথা বলছেন ?'

'সেটাই তো এ-যুগের সবচেয়ে বড়ো কথা', গুপ্ত উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। 'মনে করুন আজ স্টেট যদি শিল্পীদের ভরন-পোষণের ভার নিতো, সেটা কি অনেক সুখের হ'তো না ?'

'খুব সুখের হ'তো কি ?'

'কেন, এ-কথা বলছেন কেন ? বেশির ভাগ শিল্পীর অর্ধেক জীবনই দুঃখে কাটে—তারপর বুড়ো বয়সে যখন মান-সম্মান অর্থ-প্রতিপত্তি আসে, তখন ও-সব জিনিশের বিশেষ আর মূল্য থাকে না তাঁদের কাছে। কী ট্র্যাজিডি ভাবুন তো !'

'অর্ধেক জীবন কেন, সারা জীবনই দুঃখে কাটে শিল্পীর। দুঃখ না-থাকলে তার চলেই না। ঘটনার দুঃখ না-থাকলে সে কল্পনার দুঃখ বানিয়ে নেবে। অন্নাভাবই তো একমাত্র দুঃখ নয়।'

গুপ্ত চলতি কালের বুলি আওড়াচ্ছিলেন, ভেবেছিলেন অসীমের সম্পূর্ণ সায় পাবেন এ-সব কথায়, না-পেয়ে ভাবলেন অসীমের মতটাই বুঝি আধুনিক ছাড়িয়ে অত্যাধুনিক। নিজের

মত বদল করবার লোভ হ'লো, কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যে তা তো করা যায় না। তাই আগের কথাটাতেই আরো জোর দিয়ে বললেন, 'কিন্তু বেঁচে থাকার পথটা তো সুগম হওয়া চাই। তা যদি না হয়, তাহ'লে আর্ট বলুন, কালচার বলুন, কিছুই সার্থক হ'তে পারে না।'

'সে তো ঠিকই। মৃত মানুষ তো আর ছবি ছাখে না, গান শোনে না। জীবমাত্রকেই দেহধারণ করতে হয়, দেহধারণের উপাদান নিয়ে কাড়াকাড়ি চলেছে—কিন্তু মানুষ না-চাইতে যা পেয়েছে, তা তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আর সেই না-চাইতে পাওয়াকে নিয়েই মানুষ বাঁচে—বাঁচবার একটা যন্ত্র হ'লো দেহ।'

'আপনি খুব একটা উচ্চ ভাব থেকে কথাটা বলছেন, কিন্তু এ কি সাধারণ মানুষের কথা?'

'মানুষমাত্রেরই কথা এই।'

গুপ্ত উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'তাহ'লে আর পৃথিবী ভ'রে এই যুদ্ধ কেন? এই অশান্তি কেন? এ-যুদ্ধের পরিণতি কী হবে তা কেউ ভাবতেও পারছে না—কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের অবস্থা দিন-দিন আরো খারাপ হবে, জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর বীভৎস অভাবে দিশেহারা হ'য়ে পড়বে মানুষ—আর সবচেয়ে খারাপ হবে শিল্পীদের অবস্থা। তখন তাঁরা কী করবেন?'

অসীমবাবু শান্তস্বরে বললেন, 'জানি না। যুদ্ধের ব্যাপার কিছুই বুঝি না আমি। শুধু এটুকু আমার মনে হয় যে মানুষ না-চাইতে যা পায়, তা-ই নিয়েই মানুষ বাঁচে, আর সমস্ত পৃথিবী ভ'রে সব সময়ই তা ছড়িয়ে আছে—তার অন্ত নেই, ধ্বংস নেই, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ বিপ্লব তার কিছুই করতে পারে না।'

গুপ্ত মুখের উপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু বাইরের অবস্থার উপর আমাদের মনের শান্তি-অশান্তি তো অনেকটা নির্ভর করে। এই তোমার কথাই ধরো না—' গুপ্ত হঠাৎ 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরলেন—'তোমাকে আজ এত বড়ো সংসার চালাতে হচ্ছে, বাড়ি-ভাড়া, বাজার, ডাক্তার, চাল, চিনি, কয়লা, সমস্তটারই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে—তা যদি না হ'তো, যদি সমস্তটা সময় শুধু আর্ট নিয়েই থাকতে পারতে, তাহ'লে ছবির ভিতর দিয়ে নিজেকে যে-রকম ফোটাতে পারতে, এখন কি তা সম্ভব?'

গুপ্ত যতক্ষণ কথা বলছিলেন, অসীম নিষ্পলক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলো, কথা শেষ হওয়া মাত্র বললে, 'আপনি কি আমার আর্থিক অবস্থার বিবরণ জানতে চাচ্ছেন?'

কথটা শুনে গুপ্ত একটু অপ্রতিভ হলেন, তাঁর ফর্শা সুগোল মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। সুবন্ধুবাবুর মুখে অসীমের কথা শুনে অবধি তিনি এই দুর্দশাগ্রস্ত শিল্পীর প্রতি সমবেদনা অনুভব করছিলেন, সে-দুর্দশার পরিধি ঠিক কতখানি তা কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলে

তাঁর ভালোই লাগতো, তার সঙ্গে আচার-ব্যবহারের একটা স্থির নির্দেশ পাওয়া যেতো তাহ'লে। শিল্পীকে সাহায্য করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত, সেটা কী-ভাবে হ'তে পারে তারই একটা ইঙ্গিত এই কথাবার্তার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়ুক, এই তাঁর ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু সে-রকম কিছুই হ'লো না। গুপ্তর ধারণা ছিলো যে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারাই খুব হৈ-চৈ করে, নিজেরা যারা গরিব, এবং তাঁর অবস্থার লোকের মধ্যে যাঁদের মুখে ও-সব কথা শোনা যায়, তাঁরা অসামান্য আলোকপ্রাপ্ত। কিন্তু অসীমের কথা শুনে তাঁর ধাঁধাঁ লাগলো। তবে কি এই কথাগুলোই (যা তিনি উচ্চশিক্ষিত মহলে আজকাল প্রায়ই শোনেন) ঠিক নয়, না কি অসীম সম্বন্ধে তাঁর ধারণাই ভুল—ছবি এঁকে হয়তো বেশ দু'পয়সাই সে রোজগার করে? মনে-মনে স্থির করলেন যে তার বাড়িতে গিয়ে একদিন দেখতে হবে সে কী-অবস্থায় থাকে। সেদিনের সভা ভঙ্গ হবার আগে অসীমের ঠিকানাটা জেনে নিতে তিনি ভুললেন না।

চায়ের পর্ব শেষ ক'রে অমলা দেবী অদৃশ্য হ'লেন, গুপ্ত বারান্দায় এসে বসলেন দু'জনকে নিয়ে। ভৃত্য এসে জানালো যে আপিশের একজন লোক দেখা করতে এসেছে। 'আমি তাহ'লে এখন—' ব'লে অসীম উঠতে গেলো, গুপ্ত বাধা দিয়ে বললেন, 'না, না, বসুন—বোসো একটু। আমি আসছি এক্ষুনি।'

এর আগে অনেকক্ষণ বিশাখা একেবারেই চুপ ক'রে

ছিলো, গুপ্ত একতলায় নেমে যাবার পর বললে, 'আপনার কথাই ঠিক।'

'তোমার তা-ই মনে হয় ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বিশাখা বললে, 'একটা কথা বলবেন আমাকে ? কেন আপনি আমাকে কথা বলার যোগ্য মনে করেন না ?'

'বিশাখা, তুমি—'

'আমি হয়তো আপনার সব কথা বুঝবো না,' বিশাখা নিজের ঝোঁকে বলতে লাগলো, 'কিন্তু আপনি বুঝিয়ে দেবেন। আমি তো আপনার ছাত্রী।'

'কী-কথা তুমি শুনতে চাও, বলো তো ?'

'তা কেমন ক'রে বলি ? আপনি তো কোনো কথাই বলেন না আমাকে।'

এর পরে দু'জনেই চুপ ক'রে রইলো। গুপ্ত নিচে থেকে ফিরে এলেন। অসীম উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আচ্ছা, তাহ'লে—'

'সে কী! আর-একটু বোসো না। আমরাও বেরুবো খানিক পরে, না-হয় একসঙ্গেই—'

'না, আমার কাজ আছে। অমলা দেবীকে নমস্কার জানাবেন।'

বিশাখা সঙ্গে-সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এলো। সিঁড়ির মুখে একবার মুখ ফিরিয়ে অসীম বললে, 'চলি আজ, কেমন ?' ঐ কথাটুকু যেন গান হ'য়ে বিশাখার হৃদয়-মন ভ'রে দিলো।

গুপ্ত বললেন, 'অসীমের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে বেশ লাগলো। মাঝে-মাঝে বলিস তো ওকে।'

বিশাখা বললে, 'বাবা, শুক্কুরবার আমরা যে-সিনেমায় যাচ্ছি তাতে ওঁকে বললে তো হয়।'

'বেশ তো।'

'ফেরবার সময় রাত্তিরে একেবারে খেয়ে যাবেন।'

'ভালো। তুই তাহ'লে ব'লে দিস।'

কিন্তু শুক্কুরবারের নিমন্ত্রণ অসীম গ্রহণ করলো না। তার অনেক কাজ, কিছুতেই পারবে না।

বিশাখা একবার মাত্র বললো, 'কিছুতেই পারেন না?'

অসীম বললে, 'শোনো, বিশাখা—আমার খেতেও ভালো লাগে না, সিনেমা দেখতেও না—'

'আপনার ভালো লাগাটাই বুঝি সব? আর কারো ভালো লাগা কিছুই নয়?'

বিশাখার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে অসীম একটু চুপ ক'রে রইলো। তারপর প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে, 'আচ্ছা,আসবো।'

কিন্তু শুক্কুরবারে বিশাখার মনে হ'লো ইনি না-এলেই বুঝি ভালো হ'তো। সারাক্ষণ একটি কথা বললো না অসীম, চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে সিনেমা দেখলো, বাড়ি এসে চুপ ক'রে খেলো, এবং কিছুই প্রায় খেলো না। কথা ব'লে-ব'লে গুপ্ত হয়রান হ'য়ে গেলেন, অথচ 'খিদে নাই,' 'ভালো লাগছে না,' ছাড়া একটি

কথাও বের করতে পারলেন না তাঁর মুখ দিয়ে, তার ব্যবহারেও কোনো পরিবর্তন আনতে পারলেন না। চ'লে যাবার পর গুপ্ত বললেন, 'আর্টিস্টরা খামখেয়ালি হয় এ তো জানা কথাই—তাদের যখন যা মনে হয় তা থেকে কেউ আর নড়াতে পারে না।'

'এ-সব লোক নিয়ে ভারি মুশকিল কিন্তু,' বললেন অমলা দেবী।

'হ্যাঁ, এরা পৃথিবীর লোককে অনেক সুখ দেয়, কিন্তু নিজেরা সুখী হ'তে পারে না, আশে-পাশের লোককেও সুখী করতে পারে না।'

'বাবাঃ—দুঃখী-টুঃখী হ'য়ে কাজ নেই, বেশ আছি সুখী হ'য়ে,' অমলা দেবী হাসলেন।

বিশাখা হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'সকলের সুখ-দুঃখ তো একরকম নয়।'

'সুখ-দুঃখের আবার আলাদা-আলাদা আছে নাকি ?' অমলা দেবী বললেন, 'সুখ হ'লো সুখ, আর দুঃখ হ'লো দুঃখ—এ-কথা সকলেই বোঝে।'

কথাটা বিশাখার মনের মধ্যে আলোড়িত হ'তে লাগলো। সুখ মানেই সুখ আর দুঃখ মানেই দুঃখ ? সত্যি কি তা-ই ?

এর পরে অসীম যেদিন এলো, বিশাখা বললে, 'আপনার যদি আমাদের সংসর্গ অতই খারাপ লাগে, তাহ'লে দয়া ক'রে অনুরোধ রক্ষা করবার দরকার ছিলো না।'

'দয়া বলছো কোনটাকে ?

'আপনার সবই দয়া। আপনি দয়া ক'রে আমাকে শেখান, দয়া ক'রে আমাদের বাড়িতে আসেন, দয়া ক'রে কথা বলেন—আর কথা যখন বলেন না, সেটাও আপনার দয়া।'

ঠোঁটের কোণে পাৎলা একটু হেসে অসীম বললে, 'বেশ তো, দয়া নেবার চাইতে দয়া করাই তো ভালো। ভালো না ?'

'কিন্তু আমাদের মতো যারা অধম, দয়া নিতে তাদেরও খারাপ লাগে।'

অসীম নিঃশব্দে বিশাখার আঁকা একটি অর্ধ-সমাপ্ত ছবি দেখতে লাগলো। হঠাৎ মুখ তুলে ডাকলো, 'বিশাখা।'

যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হ'য়ে বিশাখা বললো, 'বলুন।'

'একটা কথা তোমাকে বলি। আমাকে কাছে টানবার চেষ্টা কোরো না।'

'এ-কথা কেন বলছেন ? মানুষ মানুষের কাছাকাছি আসবে, তাতে তো অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

'অল্প একটু কাছে এসে যথোচিত মাত্রায় দূরে থাকবার ভব্যতা আমি শিখিনি, বিশাখা।'

বিশাখার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো। ঠোঁট কামড়ে চুপ ক'রে রইলো একটু। তারপর খুব মৃদুস্বরে বললে, 'সকলেই আমাকে শাখা ব'লে ডাকে। আপনি শুধু বিশাখা বলেন।'

অসীম অত্যন্ত সহজভাবে বললে, 'আমার কাছে তুমি যা,

অন্য কারো কাছে তা তো নও। এই লাল রংটা লাগাও দেখি এখানে।'

বিশাখা তুলি হাতে নিয়ে থমকে রইলো। অসীম আবার বললে, 'লাগাও রং।'

'আমার—আমার ভালো লাগছে না আজ।'

'কী? শরীর খারাপ হয়েছে?'

বিশাখা বললে, 'পৃথিবীতে আপনার সম-স্তরের মানুষ নিশ্চয়ই আছে—তারা কাছে ডাকলে আপনি কি পালাতে চান?'

লোকে ছেলেমানুষের সঙ্গে যে-রকম করে,সেইরকমভাবে চোখ টিপে মুচকি হেসে অসীম বললে, 'কাজের সময় গল্প করে না। ছবিটা শেষ করো—বেশ ভালোই হবে, মনে হচ্ছে।'

অসীমের ছেলে-ভোলানো ভাবভঙ্গি দেখে বিশাখার অন্তরাত্মা জ্ব'লে গেলো।

কয়েকদিন পরে গুপ্ত টালিগঞ্জে এক আত্মীয়-বাড়ি থেকে সপরিবারে ফিরছিলেন। চড়কডাঙার মোড়ের কাছাকাছি আসতে-আসতে তিনি বললেন, 'অসীমের বাড়ি এই কাছেই। একবার গেলে হয়। কী বলিস, শাখা?'

বিশাখা ব্যাকুলভাবে ব'লে উঠলো, 'না বাবা, না।'

অমলা দেবী বললেন, 'এখন আর গিয়ে কাজ নেই। রাত হ'য়ে গেছে—'

'রাত আর কী—সবে তো ন'টা। প্রায়ই যাবো মনে করি—হ'য়ে আর ওঠে না। চল না, শাখা।'

'না, বাবা। কাউকে চিনি না ওঁর বাড়ির—এ রকম হঠাৎ—'

'আহা—জন্ম থেকেই কি আর কেউ কাউকে চেনে! দেখাশোনা হ'লেই চেনাশোনা হয়,' বলতে-বলতে গুপ্ত গাড়ি ঘোরালেন। স্ত্রী-কন্যার আপত্তি অতিক্রম ক'রে নিজের গরজেই প্রিয় মল্লিক রোডে একটি বাড়ির সামনে গাড়ি থামালেন তিনি।

অমলা দেবী তাকিয়ে বললেন, 'বেশ বাড়ি তো।'

'একতলার একটা অংশ নিয়ে থাকে। এসো।'

বিশাখা বললে, 'বাবা, আমি গাড়িতেই থাকি।'

'আহা, আয় না! কী যে তোদের—!'

দরজা খুলে দিলেন একজন প্রৌঢ়া বিধবা। গুপ্ত নমস্কার ক'রে জিগেস করলেন, 'অসীমবাবু আছেন নাকি বাড়িতে?'

'না, সে তো এখনো ফেরেনি।'

'ও, বাড়ি নেই? তা আমি—আমরা একটু এসেছিলাম—আমার নাম হৃদয়রঞ্জন গুপ্ত, আমি—'

'আর বলতে হবে না, বুঝেছি। আপনারা আমার ছেলেকে কত যত্ন করেন, আমার পরম বন্ধু আপনারা। আসুন। এই বুঝি মেয়ে? এসো, মা।'

বিশাখা ভদ্রমহিলাকে নিচু হ'য়ে প্রণাম করলো। অতিথিদের

ভিতরের ঘরে নিয়ে বসালেন তিনি, বড়ো-বড়ো দুই মেয়ে, আর তাদের চেয়ে ছোটো দুটি ছেলেকে এনে আলাপ করিয়ে দিলেন, কথাবার্তায় এমন আবহাওয়া করলেন যেন সকলেই এক পরিবারভুক্ত, অনেকদিন পর আবার দেখা হ'লো। বাড়িতে তিনটি মাত্র ঘর, কিন্তু তিনটির বেশি যেন দরকারই ছিলো না; আসবাবপত্র বেশি নয়, কিন্তু ওর বেশি হ'লে যেন বিশ্রী হ'তো। সকলেরই ভালো লাগলো এসে, ভদ্রমহিলা একটু মিষ্টি না-খাইয়ে ছাড়লেন না, গল্প করতে-করতে দশটা বেজে গেলো।

গুপ্ত উঠে বললেন, 'অনেকক্ষণ বসলাম—অসীমের সঙ্গে দেখা হ'লো না।'

'কাজ সেরে ফিরতে একটু দেরি হয় ওর। কত খুশি হ'তো থাকলে।'

বেরোবার সময় বিশাখা সামনের ছোটো ঘরটি ভালো ক'রে একটু দেখলো। ও-ঘরটি যে অসীমের তা ব'লে দিতে হয় না। সরু একটি তক্তপোশ—বিশাখার অবাক লাগলো—একজন পূর্ণবয়স্ক লোক শুতে কেমন ক'রে ঘুমোয়। টেবিলে ক'খানা বই, ছবি আঁকার সরঞ্জাম, কলম, রাইটিং প্যাড, দেয়ালে একটিমাত্র ছবি। বিশাখা পেছিয়ে পড়েছিলো, বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি একটু জল খাবো।'

'জল খাবেন?' বোনেদের একজন দৌড়ে গেলো জল আনতে।

'বসুন না,' আর-এক বোন বললে।

সুজনিতে ঢাকা তক্তপোশের উপর বিশাখা বসলো। টেবিলটির ধারে একবার হাত রেখে বললে, 'অসীমবাবু ছবি আঁকেন কোথায় ?

বোন বললে, 'এখানেই। টেবিলে ব'সে আঁকেন। ওঁর এক বন্ধুর স্টুডিও আছে—বড়ো ছবি আঁকতে হ'লে সেখানেও যান।'

জলের গ্লাশ হাতে ক'রে অন্য বোন তার কাছে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু বিশাখা তাকিয়ে রইলো চুপ ক'রে।

—'এই যে, জল।'

'ও, হ্যাঁ,' বিশাখা ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। ঢকঢক ক'রে অনেকখানি জল খেয়ে ফেলে বললে, 'উঃ, কী তেষ্টাই পেয়েছিলো!'

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে বিশাখা বললো, 'ছোটো বাড়িই ভালো, বাবা। বেশ বাড়ি-বাড়ি লাগে।'

গুপ্ত হেসে বললেন, 'বেশ, টালিগঞ্জের জমিতে ছোটো বাড়িই বানিয়ে দেবো তোকে। কিন্তু স্বরজিতের কি পছন্দ হবে ?'

'তুমি যে-রকম ছোটো বাড়ি ভাবছো আমি সে-রকম ভাবছি না।'

'তুই কী-রকম ভাবছিস বল তো ?'

বিশাখা কথাটার জবাব দিতে গিয়েও যেন থেমে গেলো। একটু পরে বললে, 'তা যা-ই বলো, বড়ো বাড়িরও সুবিধে আছে। এই তো আমাদের তেতলায় স্টুডিওটা কী সুন্দর হয়েছে। অথচ আমি তো আর সত্যি-সত্যি ছবি আঁকি না—ও প'ড়েই আছে। এক কাজ করো না বাবা, অসীমবাবুকে বলো না মাঝে-মাঝে ওখানে এসে ওঁর নিজের ছবি আঁকতে।'

'ঠিক বলেছিস। আমিও ভাবছিলাম ওকে দিয়ে দু'একখানা ছবি আঁকিয়ে কিনে রাখবো। তাতে ওর একটু উপকারও হবে—'

'ওঁর আর উপকার কী, বাবা। বাড়িতে ভালো ছবি থাকবে—সেটা আমাদেরই লাভ।'

'তোর কী মনে হয় রে? ও বেশ ভালোই আঁকে, না?'

'কী যেন, অত-শত বুঝি না আমি।'

পরের দিন অসীমের আসবার কথা নয়, কিন্তু সকালবেলা তাকে দেখতে পেয়ে বিশাখা অবাক হ'য়ে গেলো। সে তখন সবে ঘুম থেকে উঠে ড্রয়িংরুমে ব'সে খবর-কাগজ পড়ছে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো—'আপনি!'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে। কেমন আছো তুমি?'

অসীমের এই হালকা ফুর্তির ভাবটা বিশাখার মোটেই ভালো লাগলো না। নীরস কণ্ঠে বললে, 'কেমন আবার থাকবো। ভালোই আছি।'

গুপ্ত দাড়ি কামানো সেরে ঘরে ঢুকে বললেন, 'এই যে, অসীম। কাল তোমার বাড়ি গিয়ে তোমার দেখা পেলুম না।'

'ভালোই হয়েছিলো—আমার দেখা একটু বেশিই বোধহয় পাচ্ছেন আপনারা।'

'আরে না, তোমার জন্যেই আমাদের যাওয়া। তারপর—আর কী খবর-টবর, বলো।'

'মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন এই কথা বলতে, রবিবার রাত্রে কি আমাদের ওখানে একবার আসতে পারবেন আপনারা?'

গুপ্ত মনে-মনে তাঁর এনগেজমেণ্টের ফিরিস্তিটা একবার ভেবে নিয়ে বললেন, 'বেশ, আসবো। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা কিছু কোরো না। এমনিই আসবো আমরা।'

'সে আমি তো কিছু বলতে পারবো না—ও-সব মা-র ব্যাপার। আসবেন তাহ'লে? বিশাখা, তুমি আসবে তো? তোমার মা-কে একবার—'

গুপ্ত হাঁক দিলেন, 'ওগো, শোনো একবার—'

অমলা দেবীর কাছে নিমন্ত্রণের পুনরাবৃত্তি ক'রে অসীম উঠলো। বিশাখা বললো, 'আপনি তাহ'লে এই নিমন্ত্রণ করতেই শুধু এসেছিলেন?'

'অনুমতি করো, যাই। কাজ আছে।'

গুপ্ত বললেন, 'একটু চা—'

'না, সত্যি সময় নেই।'

দ্রুত প্রস্থান করলো অসীম। গুপ্ত মন্তব্য করলেন, 'নিশ্চয়ই কোনো ট্যুশনিতে যাচ্ছে। বড্ড খাটতে হয় কিন্তু ওকে।'

বিশাখা ব'লে উঠলো, 'খাটতে সকলকেই হয়। তুমি তোমার আপিশে সারাদিন খাটো না? যেখানে ওঁর খাটুনি, সেখানেই ওঁর ভালোবাসা, এইটেতে তোমাদের উপর ওঁর জিৎ।'

'তুই যে বেজায় গুরুভক্ত হ'য়ে উঠছিস দিন-দিন!' গুপ্ত হাসলেন। 'ভালো, ভালো—শিক্ষকের প্রতি ভক্তি না-থাকলে কিছু হয় না।'

রবিবার রাত্রিতে বিশাখা যতক্ষণ ও-বাড়িতে ছিলো তার মনে হচ্ছিলো সে একটা স্বপ্নের মধ্যে আছে। এমন পরিচ্ছন্নতা, এমন পারিপাট্য, এমন স্নিগ্ধ, সুস্বাদু, সুমিত রান্না, এমন সহাস্য সুস্মিত সুন্দর অভ্যর্থনা—এ-সবই যেন তার অভিজ্ঞতার বাইরে। অসীম, অসীমের মা, তার চারটি ভাই-বোন এমনকি তার বৃদ্ধা পিসিমা—অতিথিদের সমস্ত রকম সুখবিধানের জন্য বাড়ির সমস্ত লোক যেন একজন মানুষের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে। মানুষ যে মানুষের এমনি ক'রে সেবা করতে পারে, সেবা ক'রে এত সুখী হ'তে পারে—এটা তার পক্ষে একটা নতুন জিনিশ। এও তার মনে হ'লো, যে সেবা পাওয়ার চাইতে সেবা করা ভালো—সে যদি আজ এ-বাড়ির অতিথি না-হ'য়ে এ-বাড়িরই লোক হ'তো, তাহ'লে আরো কত ভালো লাগতো না জানি,

কত যে ভালো লাগতো তা সে ধারণাও করতে পারে না। সে খেলো, হাসলো, কথা বললো, সবই করলো—কিন্তু অতি তীব্র সুখের একটা আচ্ছন্ন, আবিষ্ট ভাব এক মুহূর্তের জন্যও কাটিয়ে উঠতে পারলো না।

এই ভাবটা বাড়ি এসেও কাটলো না তার, তার পরের দিনও না। তারপর এমন হ'লো যে ঐ বিহ্বলতা যেন তার নিত্যকার সঙ্গী। সমস্ত পৃথিবী যেন তার বন্ধু, কোনোখানে তার ভয় নেই, কারো কাছে তার দ্বিধা নেই। তার কণ্ঠস্বর একটু ভারি হ'লো, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'লো, চলা হ'লো স্বচ্ছন্দ, বলা হ'লো সহজ। একটা স্বপ্নের মেঘ সব সময় তাকে ঘিরে আছে যেন—তা ভেদ ক'রে কোনো দুঃখ তাকে ছুঁতে পারবে না, কোনো ক্ষতি তার নাগাল পাবে না।

বোধহয় এই জন্যেই স্মরজিতের জন্য কোনো দুশ্চিন্তা সে-সময়ে তার হয়নি। দুশ্চিন্তা হবার কারণ ছিলো। তখন মার্চ মাস, তিন মাস ধ'রে ইংলণ্ডে ভীষণ বেগে বোমা পড়ছে। স্মরজিতের শেষ চিঠি এসেছে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে, তারপর তার আর-কোনো খবরই নেই। চিঠির পর চিঠি; এয়ার-গ্রাফের পর এয়ারগ্রাফ; বাপে-শ্বশুরে মিলে তিনটে কেব্‌ল্‌ পাঠিয়েছে ইণ্ডিয়া অফিসে; কোনোটারই কোনো জবাব নেই। এদিকে রোজ সকালে কাগজ প'ড়ে শিউরে উঠতে হয়। বাইরে হাসিখুশি থাকবার চেষ্টা করলেও গুপ্ত-সাহেবের মন গভীর

ভারাক্রান্ত হ'য়ে এলো। একদিন স্ত্রীকে বললেন, 'তুমিই ঠিক বলেছিলে—বিয়েটা তখন না-দিলেই হ'তো।'

'ভেবো না—ও ভালোই আছে', অমলা দেবী সান্ত্বনা দিলেন।

'হ্যাঁ— ভালোই আছে নিশ্চয়ই—' গুপ্তও অনেকটা হালকা সুর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর বুকের উপর যেন পাথর চেপে রইলো। যদি কিছু হয়—হে ঈশ্বর—যদি কিছু হয়!

'শাখার কিন্তু কোনো উদ্বেগ দেখি না', অমলা দেবী একটু হঠাৎ বললেন।

'ও বরাবরই চাপা—নয়তো ও কি আর ওতে আছে!'

'কই, কখনো বলে না তো কিছু।'

গুপ্ত রাগের স্বরে বললেন, 'বলবে আবার কী! ও তো সে-রকম মেয়ে নয় যে চুল এলো ক'রে কাঁদতে বসবে!'

'আমার এক-এক সময় মনে হয়—'

'কী?'

'না, কিছু না।'

স্ত্রীর কী মনে হয় তা জানবার জন্য গুপ্ত পিড়াপিড়ি করলেন না। মনে-মনে ভাবতে লাগলেন কী-কী উপায়ে মেয়ের মনকে দুশ্চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখা যায়। জোর ক'রে আনন্দ-উৎসবের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলেন। আজ বাড়িতে গানের জলসা করেন, কাল রাজগঞ্জের স্টিমারে বেড়াতে যান, পরশু যান

মেয়েকে নিয়ে কোনো গণ্যমান্যের বক্তৃতা শুনতে। থিয়েটর-সিনেমা একটাও বাদ যেতে পারে না। এর উপর নিত্য-নৈমিত্তিক সামাজিকতা তো আছেই। মেয়ে যেন কখনো মন-খারাপ করবার সময় না পায়, এই তাঁর লক্ষ্য। বিশাখা এক-এক দিন আপত্তি ক'রে বলে, 'ভালো লাগে না, বাবা, এত হৈ-চৈ।'

'চল, চল, গেলেই ভালো লাগবে।'

'সত্যি লাগে না বাবা। বাড়ি ব'সে-ব'সে একা-একাই ভালো থাকি আমি।'

গুপ্ত ভাবেন, মন-খারাপ করবার একটা নেশা আছে, তাই থেকে মেয়ে বিচ্ছিন্ন হ'তে চায় না। আরো জোর ক'রে নানা জায়গায় নিয়ে যান।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বিশাখা বললে, 'মা, আমি ভোরবেলা স্বপ্ন দেখলাম স্মরজিৎ আমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে।'

কথাটা শোনবার সঙ্গে-সঙ্গে অমলা দেবীর ডান চোখ কেঁপে উঠলো। চোখ কচলে বললেন, 'তারপর?'

'আমাকে কী-যেন সব বললো, কিন্তু একটা কথাও আমি বুঝতে পারলাম না। মনে হ'লো অন্য-কোনো ভাষা বলছে।'

অমলা দেবী রুদ্ধস্বরে বললেন, 'তারপর?'

'তারপর আর কী। ঘুম ভেঙে গেলো। তুমি অমন গম্ভীর হ'য়ে গেলে যে?'

মেয়ের মাথায় হাত রেখে মা বললেন, 'না রে, কিছু না। স্মরজিৎ নিশ্চয়ই ভালো আছে—এ স্বপ্নের মানেই তা-ই। যাই—তোর চা পাঠিয়ে দিই।'

অমলা দেবী তাড়াতাড়ি উঠে স্বামীর ঘরে গেলেন। মেয়ের স্বপ্নের কথা বললেন। 'এদিকে আমারও ডান চোখটা লাফাচ্ছে', বলতে-বলতে তাঁর চোখ ভ'রে জল এলো।

'রাখো তো তোমাদের মেয়েলি কুসংস্কার।' কিন্তু কুসংস্কার-মুক্ত পুরুষের কণ্ঠস্বর তেমন তেজীয়ান শোনালো না।

'না, না—কিছু ভালো লাগছে না আমার', অমলা দেবী আঁচলে মুখ ঢাকলেন।

মার্চের অর্ধেক হ'য়ে গেলো, কোনো খবর নেই। খবরের জন্য ব্যাকুল প্রত্যাশার সঙ্গে-সঙ্গে, পাছে হঠাৎ একদিন চরম খবর আসে, এই উৎকণ্ঠা যুক্ত হ'লো। গুপ্ত রোগা হ'য়ে গেলেন, অমলা দেবী মেয়ের দিকে তাকাতে পারেন না।

মা-বাবার দুশ্চিন্তার ঢেউ বিশাখার মনকে স্পর্শ করলো। মনে-মনে সেদিনের স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলো সে। স্পষ্ট দেখলো স্মরজিৎকে, স্পষ্ট শুনলো তার গলার আওয়াজ। এ-স্বপ্নের মানে কী? স্বপ্নের আবার কোনো মানে আছে নাকি—ও-সব বাজে কথা। তারপর ভাবলো, লণ্ডন শহরে কত লক্ষ-লক্ষ লোক তো আছে—বোমা বেছে-বেছে তার স্বামীর মাথার উপরেই বা পড়বে কেন? কিন্তু কিছু কি বলা যায়? যদি

স্মরজিৎ না ফেরে? কথাটা মনে করতেই তার বুকের ভিতরটা এমন জোরে লাফ দিয়ে উঠলো যে রুদ্ধ হ'য়ে এলো নিশ্বাস। না, না—এ-সব কী ছাইভস্ম ভাবছে সে, ঠিক আছে সব, স্মরজিতের কিছু হয়নি।

মা-বাবাকে সে বললে, 'তোমরা অমন দুশ্চিন্তা করো কেন সব সময়?'

মেয়ের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে গুপ্ত বললেন, 'না—দুশ্চিন্তা কিসের।'

'ভেবো না তোমরা—শিগগিরই ওর চিঠি আসবে, দেখো।'

গুপ্ত একটু অবাক হলেন। কোথায় মেয়ের মন ভালো করবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছেন তিনি, এদিকে মেয়েই নাকি তাঁদের সান্ত্বনা দিচ্ছে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন একবার, অমলা দেবী চেষ্টা ক'রে মুখে হাসি এনে বললেন, 'তুই নিশ্চিন্ত থাকলেই আমরা নিশ্চিন্ত। আর কী!'

বিশাখা বললে, 'আমার তো কোনো ভাবনাই হয় না, মা।'

গুপ্ত ব'লে উঠলেন, 'ঠিক! এই রকমই হওয়া উচিত। আমাদের বয়েস হ'য়ে গেছে কিনা—তাই বোধহয় অন্য-সব রোগের মতো ভাবনাও একবার আক্রমণ করতে পারলে আর সহজে ছাড়ে না।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বললেন, 'অসীমকে যে ছবি আঁকার কথা বলেছিলাম, তার কী হ'লো?'

'কী যেন, কিছু তো বলেন না উনি।'

'একটু মনে করিয়ে দিস তো।'

পরের দিন বিশাখা অসীমকে বললো, 'বাবা জিগেস করছিলেন, আপনি কবে থেকে আঁকা শুরু করবেন।'

'হবে।'

রবিবারের রাত্রের সেই নিমন্ত্রণের পর প্রায় একমাস কেটে গেছে। গুপ্ত সেদিনই অসীমকে জানিয়েছিলেন যে তার আঁকা দু'একখানা ছবি তিনি বাড়িতে রাখতে চান, আর সে-ছবি যদি সে ঐ তেতলার স্টুডিওতে ব'সেই আঁকে তাহ'লে অত্যন্ত খুশি হন। এই প্রস্তাবে অসীম তেমম উৎসাহ বা অনিচ্ছা কোনোটাই প্রকাশ করেনি, শুধু ঘাড় নেড়ে বলেছিলো, 'আচ্ছা।' কিন্তু ঐ আচ্ছা পর্যন্তই, তার পরে আর কিছুই না।

বিশাখা আবার বললে, 'বাবার প্রস্তাবে আপনার যে সম্মতি নেই, সে-কথা ওঁকে তখন বললেই হ'তো।'

একটা ব্যথিত ভাব অসীমের সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়লো, চোখ নিচু ক'রে বললে, 'আঁকবো ছবি।'

'কবে থেকে?'

'শিগগিরই।' চোখ তুলে অনেকটা সহজভাবে বললে, 'মিস্টর দাশের চিঠিপত্র পাচ্ছো নিয়মিত?'

অত্যন্ত সংগত এবং সৌজন্যসম্মত প্রশ্ন, কিন্তু কথাটা শুনে বিশাখার একটা অস্পষ্ট রাগ হ'লো। আঙুল দিয়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে বললে, 'আপনিও কি তার জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত?'

অসীম শান্তভাবে বললে, 'তোমাকে চিনি, তাই তাঁর কথাও মনে পড়ে। ভালো আছেন তিনি ?'

'আমার বিশ্বাস তিনি ভালোই আছেন। কিন্তু তাঁর চিঠিপত্র অনেকদিন আসে না—মা-বাবা ভীষণ ভাবছেন, আত্মীয়-স্বজন সবাই ভাবছে, এখন আপনিও ভাবুন, নয়তো ভালো দেখায় না।'

অসীম স্থির দৃষ্টিতে বিশাখার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বিশাখা তাকিয়ে রইলো নির্ভয়ে, তার চোখের উপর একটি স্বচ্ছ ভিজে-ভিজে আভা চিকচিক ক'রে উঠলো।

'বিশাখা, আমি কিছু বললেই তুমি রাগ করো কেন ?'

'আপনি আবার কিছু বলেন নাকি!' বিশাখা অস্ফুট হাসলো।

'কিছুদিন ধ'রেই দেখছি তুমি মাঝে-মাঝে হঠাৎ আমাকে একটা রূঢ় কথা ব'লে ফেলো। নিশ্চয়ই বোঝো না যে রূঢ়, নয়তো বলতে না।'

অসীমের ব্যথিত মুখের দিকে তাকিয়ে বিশাখার প্রাণ-মন উল্লাসে আবর্তিত হ'য়ে উঠলো। নম্র অথচ দৃঢ় স্বরে বললে, 'সত্য কথাই আপনার কানে রূঢ় শোনায়। আপনার অপরিসীম ভদ্রতা দিয়ে সমস্ত সত্যই আপনি ঢেকে রাখেন—আমি তা পারি না। আমি জানি এখানে আসতে আপনার ভালো লাগে না—আমাকে ছবি আঁকা শেখাতে ততোধিক

খারাপ লাগে—মনে-মনে এই প্রার্থনাই আমি দিন-রাত করছি যে স্মরজিৎ তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক—সে এলেই তো আমি আর ছবি আঁকা শিখবো না—আপনিও বাঁচবেন, আমাকেও আপনার চোখের তলায় ব'সে অপমানিত হ'তে হবে না প্রতিদিন।'

অসীম চুপ ক'রে বিশাখার সমস্ত কথা শুনলো, তারপর সস্নেহে বললে, 'ছেলেমানুষ!' হাত বাড়িয়ে বিশাখার আনত মাথাটি স্পর্শ করলো সে, সঙ্গে-সঙ্গে বিশাখা হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজলো, অনেকক্ষণ আর মুখ তুললো না।

মার্চের শেষে স্মরজিতের চিঠি এলো। ভালো আছে। অন্যান্য খবরের পর লিখেছে যে যুদ্ধের জন্য তাদের ট্রেনিং-এর মেয়াদ খুব সম্ভব এক বছর কমিয়ে দেয়া হবে—তা যদি হয় তাহ'লে দেশে ফিরবে কয়েক মাসের মধ্যেই।

তিন মাস পরে গুপ্ত মন খুলে হাসলেন। বাড়ির আবহাওয়া হালকা হ'লো, সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানে প্রাণ ফিরে এলো।

ততদিনে অসীম গুপ্তর জন্য ছবি আঁকতে শুরু করেছে। যে-সময়টা শেখাবার জন্য নির্দিষ্ট, তাতে সে নিজের কাজ করবে না—সপ্তাহের অন্যান্য দিনে বিকেলবেলার দিকে এসে ঘণ্টাখানেক এঁকে চ'লে যায়। দু'দিনই এসেছে এ-পর্যন্ত। প্রথম দিন তো কাগজের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে শুধু সিগারেটই খেলো, তারপর গুপ্ত-সাহেবের সঙ্গে একটু গল্প ক'রে চ'লে গেলো।

পরের দিন সে আসা মাত্র বিশাখা নিজের হাতে এক পেয়ালা চা তৈরি ক'রে নিয়ে এলো উপরে, চা-টা ভালোবেসেই খেলো, যাবার আগে আর-এক পেয়ালা চা আনলো বিশাখা, তা দেখে অসীম খুশি হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'বাঃ, লক্ষ্মী মেয়ে!'

বিশাখা বললো, 'আপনি ও-রকম বলেন কেন? আমি কি ছেলেমানুষ নাকি?'

'বাঃ, বড়োরা বুঝি লক্ষ্মী হয় না?'

'হয়, কিন্তু আমি তো নই। আমি তো আপনাকে কেবল রূঢ় বাক্যই বলি।'

সেদিন কাগজের গায়ে ছবির একটা অস্পষ্ট আভাস ফুটলো। কী হবে, এখনো বোঝা যাচ্ছে না। পরের দিন একটু সকাল-সকাল এলো, এসেই শুরু করলো কাজ, চা-ও খেলো না। কাছে দাঁড়িয়ে বিশাখা দেখতে লাগলো, দেখতে-দেখতে কেবলই অবাক হ'লো। চিত্র দেখবে না চিত্রকরকে দেখবে ভেবে পেলো না। ঐ তো শান্ত চুপচাপ মানুষ—ওরই মধ্যে কী শক্তি! প্রতিদিনের কোমল কণ্ঠস্বর আর মৃদু ব্যবহারের আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে এ কে? দু' চোখ জ্ব'লে উঠেছে, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, হাতটি যেন দারুণ সংযমে কোনো প্রচণ্ড শক্তির বল্‌গা চেপে আছে—তুলির টানে-টানে রেখা-রঙের শিখা যেই লাফিয়ে উঠতে চাচ্ছে, অমনি সেই তুলির আঘাতে নত হ'য়ে যাচ্ছে তাদের উদ্ধত মাথা। আঁকতে-আঁকতে অসীম

মাঝে-মাঝে বিশাখার দিকে তাকালো,' কিন্তু মুখে তার কথা নেই ; একবার অমলা দেবী দেখতে এলেন, গুপ্ত-সাহেব আপিশ থেকে ফিরে একটু ঘোরাঘুরি ক'রে গেলেন, কিন্তু ভ্রূক্ষেপই নেই অসীমের। দু'বার দু' পেয়ালা চা ঠাণ্ডা হ'লো। অবশেষে যখন দিনের আলো প'ড়ে এলো, পৃথিবীর সব রঙের উপরেই সূর্যাস্তের লাল আভা লাগলো, তখন তুলি নামিয়ে রেখে একটু দূরে স'রে অসীম ছবিটি দেখলো খানিকক্ষণ, তারপর জানালার ধারে সোফাটির উপর এসে বসলো।

বিশাখা বললো, 'এখন চা দিই ?'

'পরে হবে। আমার সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও তো সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে। একটু বোসো না।'

সোফার অন্য প্রান্তে ব'সে বিশাখা জিগেস করলো, 'আর ক'দিনে শেষ হবে ?'

'দু'একদিনেই হ'য়ে যাবে।'

'আপনি খুব ভালো আঁকেন। আপনার মতো কেউ আঁকতে পারে না।'

অস্ফুট নরম গলায় অসীম হেসে উঠলো।

'জগতের কাছে আমার এ-কথার কোনো মূল্য নেই, জানি ; কিন্তু জগতের মূল্যই কি সব সময় চরম ?'

'না, তা কেন। প্রত্যেকের ভালো লাগার মূল্য তার নিজের কাছে।'

'অথচ দেখুন, আমার ভালো লেগেছে, এই কথাটা বলতে আমরা কতই না ভয় পাই।'

'হ্যাঁ—পাছে অন্যেরা সেটা হেসে উড়িয়ে দেয়, পাছে কালের পরীক্ষায় সেটা বাতিল হ'য়ে যায়। আর তা-ই তো হয়—বিশেষ ক'রে অল্প বয়সের ভালো-লাগায়। যে-ভালো-লাগা পৃথিবীর লোক মেনে নিয়ে ধন্য হবে, সে-ভালো-লাগা আয়ত্ত করতে মাথার চুল পেকে যায়, বিশাখা।'

বিশাখা একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনিও তো আমার ভালো-লাগাটাকে বাতিল ক'রেই দিলেন।'

'না, তা কেন। তোমার যে ভালো লাগছে তাতে তো এটাই প্রমাণ হয় যে বিধাতা তোমাকে ভালোবাসেন,' বলতে-বলতে অসীম উঠে দাঁড়ালো। 'চলো, নিচে গিয়ে চা খাওয়া যাক।'

আর দু'দিনেই ছবি শেষ হ'লো। ছবির বিষয় কিছু অভিনব নয়, বরং মামুলিই বলা যায়। বসন্তকাল; কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে; শাড়ির রঙে একটা লাল-সবুজের আনন্দধ্বনিতে আকাশ যেন ভ'রে গেছে।

শেষ-করা ছবি দেখে গুপ্ত প্রথম কথা বললেন, 'মেয়েটির মুখ অনেকটা শাখার মতোই হয়েছে।'

অসীম বললে, 'তা হবে। সব সময় কাছে থাকতো, হয়তো আদল এসেছে।'

গুপ্ত যথোচিত সময় ধ'রে ছবিটিকে নিরীক্ষণ করলেন।

তারপর অসীমের দিকে ফিরে বললেন, 'তা এটার জন্য—এটার জন্য তোমাকে—'

'একেবারে যাতে-হাতে নগদ দাম দিয়ে প্রার্থীকে বিদায় করবেন ?'

গুপ্ত লজ্জিত হ'য়ে বললেন, 'না, না, সে-কথা নয়—আই মীন, এটা তো তোমার প্রোফেশন—আর আমিই তো তোমাকে বলেছিলাম ছবির কথা—'

'আচ্ছা, সে হবে।'

এমন-একটা নিষ্কম্প্র গাম্ভীর্যের সঙ্গে অসীম বললো কথাটা যে গুপ্ত পর্যন্ত আর-কিছু বলতে পারলেন না। ছবিটি ভালো ক'রে ফ্রেম করিয়ে এনে রাখলেন ড্রয়িংরুমে। বাড়িতে যে এলো সে-ই বললো যে ছবির মেয়েটি অবিকল বিশাখার মতো দেখতে।

অমলা দেবী বললেন, 'অসীম তোকেই এঁকেছে, শাখা। তোর সেই সবুজ মান্দ্রাজি শাড়ি পর্যন্ত।'

'কী যে বলো, মা ! পৃথিবীতে যেন ঐ একখানাই সবুজ শাড়ি !'

'ছাখ না, ঠিক ঐ রকম ক'রেই তুই দাঁড়াস।'

ছবিটার দিকে এক পলক তাকিয়ে বিশাখা বললে, 'তা-ই নাকি ? তবে তো ভালোই দাঁড়াই আমি।'

মেয়েকে একটু আদর ক'রে মা বললেন, 'লক্ষ্মী মেয়ে তুই আমার—তোর কপালেই স্মরজিতের ফাঁড়া কাটলো।'

এর পর স্মরজিতের চিঠি নিয়মিতই আসতে লাগলো। জুন মাসে একটি চিঠিতে সে লিখলে যে তাদের ট্রেনিং-এর মেয়াদ শিগগিরই শেষ হবে—খুব সম্ভব অগস্ট মাসেই দেশে পৌঁছতে পারবে সে। এ-খবর পেয়ে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব একত্র ক'রে বিরাট একটি ভোজ দিলেন গুপ্ত। অসীমকেও বলবার ইচ্ছা ছিলো তাঁর, কিন্তু 'অত লোকজন গোলমালের মধ্যে তাঁর ভালো লাগবে না,' ব'লে বিশাখা বারণ করলো। সেদিন বিশাখাকে দেখে সকলেই বললো যে সে দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে, স্মরজিৎ যেমন বিদ্বান ও মস্ত চাকুরে, শাখার মতো মেয়েও তেমনি দুর্লভ, যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের এ-রকম মিলন আমাদের দেশের বিয়েতে কমই হয়। গুপ্তর সুবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির খুব প্রশংসা হ'লে, দম্পতীর সুন্দর মধুর দীর্ঘ জীবন যেন সমস্ত দেশের সামনে একটা উদাহরণ হ'য়ে থাকে, এই রকম সব শুভকামনার বর্ষণ বিশাখাকে আচ্ছন্ন করলো। সমবয়সি একটি মেয়ে ঠাট্টা করলো, 'কী, দিন আর কাটছে না, না ?'

বিশাখা বললো, 'বড্ড তাড়াতাড়িই কাটছে। দেখতে-দেখতে একটা বছর !'

গালে টোকা দিয়ে মেয়েটি বললো, 'ফাজিল !'

কিন্তু বিশাখা ঠিকই বলেছিলো—সিংহের তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো দিনগুলি যেন দৌড়চ্ছে। দেখতে-দেখতে বর্ষা এসে পড়লো।

সকাল থেকে সেদিন মেঘলা৷ দশটার একটু পর থেকে মেঘ এমন ঘন হ'লো যে ঘরের মধ্যে ভালো ক'রে দেখা যায় না। স্টুডিওতে ব'সে-ব'সে বিশাখার মনে হ'লো যেন এই ঘরটিও মেঘ-লোকেরই মধ্যে—ঐ যে আকাশে পরতে-পরতে মস্ত কালো দুরন্ত মেঘ, ও-মেঘ যেন এক্ষুনি এই ঘরটিকে উড়িয়ে নিয়ে চ'লে যাবে সীমাহীন উদ্‌ভ্রান্ত আকাশে।

অসীম নিবিষ্ট হ'য়ে ইম্প্রেশনিস্ট ছবির একটা অ্যালবম দেখছিলো—কয়েকদিন আগে স্মরজিৎ পাঠিয়েছে বিশাখাকে—চোখ না-তুলেই বললো, 'আলোটা জ্বালো তো।'

বিশাখা বললে, 'থাক।'

'থাক কেন?' অসীম চোখ তুললো, 'কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

'না-ই বা গেলো।'

বাইরের দিকে তাকিয়ে অসীম বললো, 'ঈশ, খুব মেঘ করেছে তো।'

'হ্যাঁ, আজ সারাদিন ধ'রে বৃষ্টি হবে—আপনার আর বাড়ি যাওয়া হবে না।'

'বর্ষার দিন ভালোই লাগে, কিন্তু কাজ বড়ো নষ্ট হয়।'

'কাজ ছাড়া কিছুই বুঝি জানেন না আপনি?'

একটু চুপ ক'রে থেকে অসীম বললো, 'জানবো না কেন, খুবই জানি।' সেই অন্ধকারে অসীমের চোখ যেন আরো বড়ো, আরো প্রখর-উদ্দাম হ'য়ে বিশাখার মুখের উপর অসহ্য আঘাত

করতে লাগলো। 'কিন্তু আমার ছুটি বোনের বিয়ে দিতে হবে, ছুটি ভাইকে মানুষ করতে হবে—আমার সময় নেই, বিশাখা,' বলতে-বলতে অসীম উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্গে-সঙ্গে বিশাখাও দাঁড়িয়ে বললে, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'যাই। আজ তো আর কাজ হবে না। এক্ষুনি বেরোলে বৃষ্টির আগেই পৌঁছতে পারবো।'

বিশাখা স্টুডিওর ছোট্ট দরজা ছুই হাতে আগলে দাঁড়ালো। —'না আপনি যাবেন না।'

'পথ ছাড়ো, বিশাখা।'

'আপনি যাবেন না।'

'আমাকে যেতে দাও—'

'না, না, আপনি যাবেন না। কেন আপনি ভাণ করেন? কেন নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেন? আপনি জানেন—আমিও জানি—যে ছবি আঁকতে আমি পারি না, পারবো না—কোনোকালেও ও-দিকে কিছু হবে না আমার—তবু কেন রোজ আপনার কাছে বসি, আঁকা-আঁকা খেলা করি? সে কি শেখবার জন্য? সে যে কিসের জন্য তা যদি আপনি—'

'চুপ!' অসীম গর্জন ক'রে উঠলো, 'আর-একটি কথা উচ্চারণ কোরো না।'

অসীমের কণ্ঠস্বরে বিশাখা কেঁপে উঠে স'রে গেলো।

দরজাটা একটু ফাঁক পেয়ে অসীম এক লাফে বাইরে এসে বললো, 'আমি যাচ্ছি।'

পিছন থেকে চীৎকার ক'রে বিশাখা বললো, 'না, না, যাবেন না—' কিন্তু ততক্ষণে অসীম অর্ধেক সিঁড়ি নেমে গেছে। সে-ও চ'লে গেলো, আর মেঘ ডেকে উঠলো গুরুগর্জনে, ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামলো আকাশ ভেঙে। বিশাখা ছাতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আকুল হ'য়ে ভিজলো। ভিজতে-ভিজতে তার সমস্ত শরীরে যখন কাঁপুনি ধ'রে গেছে, তখন শপশপ করতে-করতে সমস্ত সিঁড়ি ভিজিয়ে নিচে নামলো। অমলা দেবী দেখে অবাক।—'এ কী রে?'

'বৃষ্টিতে ভিজলাম, মা।'

'ভিজলি? কেন?'

'খুব ভালো লাগলো।'

'অসীম কোথায়?'

'চ'লে গেছে—' আর কথা না-ব'লে বিশাখা স্নানের ঘরে ঢুকলো কাপড় ছাড়তে।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক এলো অসীম। বিশাখা বললো, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি আর আসবেন না।'

'কেন বলো তো?'

'আমি আপনাকে বলেছি ছবি আঁকায় আমার মন নেই, তবু আমাকে শিখিয়ে সময় নষ্ট করবেন?'

'আর ক'দিনই বা। মিস্টার দাশ তো শিগগিরই আসছেন, তারপর তো আর শিখবে না।'

'আমি এখন থেকেই ছেড়ে দিতে চাই।'

বিশাখার কথা গ্রাহ্য-না-ক'রে অসীস বললো, 'এসো, কাজ করো। এ-রকম পাগলামি করে না। তুমি কি ভাবছো তুমি নামজাদা আর্টিস্ট হ'তে পারবে না ব'লেই তোমার এ-শিক্ষা ব্যর্থ? তা নয়—এতে তোমার মন যদি জেগে থাকে সেটাই মস্ত লাভ, জেনো। এ-মন তোমার চিরজীবনের সঙ্গী হ'য়ে রইলো। ভালোকে ভালোবাসতে শিখলে, এর চেয়ে বড়ো কথা আর কী।'

বিশাখা বললো, 'কিন্তু এতে শুধু জীবনের দুঃখই বাড়ানো হ'লো, অসীমবাবু। ভালোকে আমি পাবো কোথায় যে ভালোবাসবো?'

অসীম গম্ভীর স্বরে বললে, 'ভালোর কি অভাব! পৃথিবীতে কি ভালোর অন্ত আছে!' একটু চুপ ক'রে থেকে, একটু হেসে বললে, 'সেই ভালোকে অনুভব করবার মন তোমার জাগিয়ে দিলাম। অনেক, অনেক বছর পরে, জীবনের ফেনা যখন কেটে যাবে, নিজেকে নিজেরই মধ্যে সম্পূর্ণ ক'রে পাবার শক্তি যখন হবে তোমার, তখন কোনো-এক রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বুঝতে পারবে যে আমি তোমার ক্ষতি করিনি।'

বিশাখা নতমুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। অসীম একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে

বললে, 'নাও, তুলি হাতে নাও। আজ বেশ ভালো ক'রে কাজ করা যাক।'

অগস্টের মাঝামাঝি স্মরজিৎ এসে পৌঁছলো। কলকাতায় দু'দিন কাটিয়ে সে বাঁকুড়া গেলো বাবার কাছে, কয়েক দিন পরে আবার যখন এলো অমিয়াংশুবাবুও এলেন ছেলের সঙ্গে। তিনি উঠলেন বালিগঞ্জে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে, স্মরজিৎ শ্বশুরবাড়িতেই থাকলো। তার প্রথম চাকরি হয়েছে খুলনায়, পয়লা সেপ্টেম্বর থেকেই জোয়াল ঘাড়ে নিতে হবে, ভারি ব্যস্ত সে। দিনের বেলায় সরকারি অঞ্চলে আনাগোনা করতে হয়, সন্ধ্যাবেলা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখাশোনা করতে বেরোয়—স্ত্রীকে নিয়ে বেরোয় না, আর ক'দিন পরেই তো মা-বাবার সঙ্গে ওর চিরবিচ্ছেদ, থাক এখন কাছে-কাছে—স্বামী-স্ত্রীতে ভালো ক'রে দেখা হয় সেই রাত্রিতে শোবার সময়। এ-রকম অবস্থায় এ-রকম বয়সের স্বামী-স্ত্রী সাধারণত অনেক রাত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-স্বপ্ন দেখে কাটায়, কিন্তু তাদের স্বপ্ন দেখবার কিছু নেই, নদীর ধারে চমৎকার বাংলো থেকে শুরু ক'রে অপেক্ষা-করার ঘরে বহুক্ষণ-ব'সে-থাকা স্থানীয় ভদ্রলোকদের চমক-লাগানো সূক্ষ্ম ছুঁচলো 'ব্যেরা' ডাক পর্যন্ত সবই একেবারে অবধারিত। কথাবার্তা তাই খুব বেশি হয় না দু'জনের। সিল্কের স্লিপিং স্যুট প'রে লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে স্মরজিৎ হয়তো বলে, 'কেমন ছিলে, শাখা।

'কেমন আবার থাকবো।'

'তোমার বুঝি খুব ভয় হয়েছিলো আমার জন্য ?'

'মা-বাবা খুব ব্যাকুল হয়েছিলেন—আমার মোটেও ভয় হয়নি।'

'কী করলে এই এক বছর ?'

'কী আর করলাম! খেলাম, ঘুমোলাম, মোটা হলাম।'

'না, মোটা তো হওনি,' মাপ নেবার মতো ক'রে দু'আঙুল দিয়ে বিশাখার বাহুতে চাপ দিয়ে স্মরজিৎ বললে, 'যেটুকু হয়েছো, ভালোই হয়েছে। আগে একটু রোগাই ছিলে।'

'কে জানে—এখন থেকে কেবলই হয়তো মোটা হ'তে থাকবো।'

'পাগল! সে আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না,' ব'লে স্মরজিৎ স্ত্রীর একটু কাছে স'রে আসে।

বিশাখা জড়িত স্বরে বলে, 'উহুঁ—ঘুম পাচ্ছে বড্ড।' কিন্তু খানিক পরে স্মরজিৎ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, বিশাখা উঠে কুঁজো থেকে গড়িয়ে জল খায়, জানালার ধারে একটু দাঁড়ায়, মনে হয় বড্ড গরম, চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে আবার এসে শোয়, চোখ যতবার ঘুমে লেগে আসে, ততবারই হঠাৎ কী-যেন মনে প'ড়ে চমকে ওঠে। ভাদ্র মাসের এই মেঘ-চাপা গরম ভারি বিশ্রী।

একদিন স্মরজিৎ জিগেস করলে, 'তোমার ছবি আঁকা শিক্ষা কী-রকম হ'লো ?'

'হ'লো একরকম।'

'কী-সব আঁকলে আমাকে দেখালে না তো।'

'দেখবে। সময় আছে অনেক।'

'সেদিন ঐ ছোকরার সঙ্গে কথা হ'লো খানিকক্ষণ—আহা, কী না নাম—ঐ যে, তোমাকে ছবি আঁকা শেখায়—'

'ছোকরা-ছোকরা বলছো কাকে? তোমার চেয়ে বয়েসে বড়ো।'

'নামটা কী বলো তো? হ্যাঁ—অসীম। মডর্ন আর্ট নিয়ে খানিকক্ষণ কথা হ'লো। আমি দেখলাম, বিলেত না-গেলে আর্ট সম্বন্ধে ভালো ধারণা হয় না।'

বিশাখা হঠাৎ বললে, 'স্মরজিৎ, ছেলেবেলা থেকেই তুমি একটু ডেঁপো। এখন বড়ো-সড়ো হয়েছো, এখন আর মানায় না। ও-সব ছাড়ো।'

এ-রকম কথা এই সুদীর্ঘ পরিচয়ে বিশাখার মুখে স্মরজিৎ কখনো শোনেনি। অবাক হ'য়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কী হয়েছে তোমার?'

স্মরজিতের চোখ্ থেকে চোখ না-সরিয়ে বিশাখা বললে, 'কিছু হয়নি। ঠিক আছি আমি।'

এমন-একটা ভাব স্মরজিতের মুখে ছিলো যেন সে স্ত্রীকে উপযুক্ত শাসন করতে উদ্যত। কিন্তু হঠাৎ একটা মন-গলানো হাসিতে তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেলো। কোমল সুরে বললে, 'আমাকে ছেলেবেলা থেকে দেখছো, আমার কিছুই

অজানা নেই তোমার কাছে। 'আমার কথায় প্যাঁচ নেই, আমার মনেও না। তোমার মাস্টার মশাইকে অসম্মান করতে আমি চাইনি—তাঁর কাজ আমার ভালোই লাগে। সেইজন্যই—'

'এ-সব কথা আমাকে বলছো কেন—তাঁরই সঙ্গে ব'সে যত খুশি আর্টের চর্চা কোরো—আমি এ-সবের কী বুঝি!'

'তোমাকে যে-ছবিখানা দিয়েছেন সেখানা খুবই ভালো হয়েছে।'

'আমাকে আবার ছবি দিলেন কবে?'

'ঐ যে, ড্রয়িংরুমে—'

'ও তো উনি বাবার জন্য এঁকেছেন। বাবা কিনেই নিয়েছেন বোধহয়।'

ঠোঁটের কোণে একটু হেসে স্মরজিৎ বললো, 'কিনে কেন? একখানা ছবি উনি কি উপহার দিতে পারতেন না?'

'আমার বাবা তো আই. সি. এস. নন যে সকলের কাছেই উপহার আশা করবেন।'

'আমি কি তা-ই বললাম—লোকে তো ভালোবেসেও দেয় অনেক সময়··· তা ছবিখানা সত্যি ভালো হয়েছে। অবশ্যি আমার ভালো লাগবার বিশেষ-একটা কারণও আছে—মেয়েটি হুবহু তোমার মতো।'

'সকলেই তা-ই বলে।'

'প্রথমে আমার ততটা মনে হয়নি, কিন্তু ছবিখানা যত দেখছি ততই আমার মনে হচ্ছে যে ও তোমারই ছবি।'

'ভালোই হ'লো', বিশাখা বললে, 'তোমার স্ত্রীর একটা পোর্ট্রেট হ'য়ে রইলো।'

যাবার দিন এসে পড়লো। এতদিন পরে মেয়েকে বিদায় দিতে হবে—আনন্দের মধ্যেও অমলা দেবীর চোখ-মুখ ছলোছলো, গুপ্তও মনের ভার লুকিয়ে রাখতে পারছেন না চেষ্টা ক'রেও। শুধু বিশাখাই যেন নির্বিকার। যেমন স্মরজিৎ বিলেতে থাকতে তার আচরণে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ পায়নি, তেমনি এখনো দুঃখের ছায়া নেই তার মুখে। সে সুটকেশ গোছাচ্ছে, জিনিশপত্র কিনছে, বন্ধুদের কাছে টেলিফোনে বিদায় নিচ্ছে। সে যে যাবে, এটা যেন চিরকালের স্বতঃসিদ্ধ কথা। স্বতঃসিদ্ধ নিশ্চয়ই—কিন্তু তাই ব'লে একটুও কি দুঃখ হ'তে নেই? আশ্চর্য মেয়ে!

রবিবার ওদের যাত্রার দিন। শুক্রবার সকাল দশটায় যথারীতি এলো অসীম, এসে বললে, 'বিশাখা, আজই শেষ।'

বিশাখা বললো, 'আপনি তো খুব খুশি?'

'খুশি কেন?'

'আর তো কেউ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধ'রে রাখবে না আপনাকে, এখন স্বাধীন হলেন।'

'খুব স্বাধীন-স্বাধীনই লাগছে বটে।'

'সেদিন ঐ বৃষ্টির মধ্যেই গেলেন তো? এ কি আমি জীবনে ভুলবো!'

অসীম হেসে বললো, 'ভুলবে, বিশাখা, ভুলবে।'

বিশাখা রুদ্ধস্বরে বললে, 'আপনি হেসে-হেসে ও-কথা বলতে পারলেন আমাকে! আপনি কি মানুষ!'

অসীমের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠলো। চুপ ক'রে রইলো একটু, তারপর ধীর স্বরে বললে, 'হ্যাঁ বিশাখা, আমিও মানুষ। সে-কথাটা তোমাকেই মনে করিয়ে দেয়া দরকার।' বিশাখা কী-যেন বলতে যাচ্ছিলো, অসীম হাত তুলে তাকে বাধা দিলো।—'কেন দরকার তাও বলি। তুমি শুধু নিজের কথাই ভাবছো—আমি যে মানুষ, আমারও যে রক্ত আছে, মাংস আছে, ইচ্ছা আছে, প্রাণ আছে—এ-কথা কি কখনো তোমার মনে হয়?'

অসীমের কথাগুলিতে একটুও উত্তেজনা প্রকাশ পেলো না, কিন্তু শুনতে-শুনতে বিশাখার মাথার ভিতরে আগুন জ্ব'লে উঠলো। নিষ্ঠুর বিদ্রূপের সুরে ব'লে উঠলো, 'কী ক'রে মনে হবে? আপনি যে সত্যি-সত্যি পাথরের মূর্তি নন, তা কেমন ক'রে বুঝবো আমি?'

'সত্যিই তো—তা তুমি বুঝবে না। আর ঐ পাথরের মূর্তি হবার জন্য কী-মূল্য আমাকে দিতে হচ্ছে, তাও তুমি বুঝবে না, বিশাখা।'

'কাকে দিচ্ছেন মুল্য? তার কি কোনো অস্তিত্ব আছে?'

'দিচ্ছি তোমাকে। তোমার সমস্ত জীবনকে।'

'চাই না! চাই না!' বিশাখা এমন জোরে মাথা ঝেঁকে উঠলো যে তার খোঁপা ভেঙে সমস্ত পিঠময় চুল পড়লো ছড়িয়ে। 'ও-মূল্য চাই না আমি। আজ এই শেষের দিনে আপনি বলুন— একবার বলুন—যে আপনি আমাকে—'

'বিশাখা!'

'না, না, আমি বলবোই—আমাকে থামাতে পারবেন না আপনি—আজ আমি বলবোই।'

অসীম তন্ময় চোখে বিশাখার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে বললে, 'বেশ, বলো। কিন্তু ভেবে দেখেছো কি, সে-বলার মানে কী? ব'লে তুমি চ'লে যাবে, তা তো হ'তে পারে না, বিশাখা। তাই বলি—বোলো না, চুপ করো, শান্ত হও।'

বিশাখা সম্মোহিতের মতো বললে, 'না, আমি চ'লে যাবো না।'

অসীমের দুই চোখ যেন ভিতরের কোনো আলোয় আরো, আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। নিশ্বাসের সুরে বললে, 'যাবে না? সে-সাহস তোমার আছে? সে-শক্তি আছে? এক্ষুনি জবাব দিয়ো না—ভেবে ভাখো।'

বিশাখা হঠাৎ যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। স্থির দৃষ্টিতে অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ, তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় জল

পড়তে লাগলো। অসীমের পায়ের উপর হাত রেখে বললে, 'আমাকে দয়া করুন—আমাকে ক্ষমা করুন।' তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো, দরজার কাছে স্মরজিৎ দাঁড়িয়ে। অসীম একদৃষ্টিতে বিশাখার দিকে তাকিয়ে ছিলো, তার চোখে ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে সে-ও মুখ ফেরালো। স্মরজিৎকে দেখতে পেয়েই বললে, 'আসুন। বিশাখা বড্ড বিচলিত হ'য়ে পড়েছে—আপনি আসুন, শান্ত করুন ওকে।'

স্মরজিৎ ব'লে উঠলো, 'বাঃ! চমৎকার শিক্ষা হচ্ছে! চমৎকার!' মানুষের কণ্ঠনালী চেপে ধরলে যে-রকম আওয়াজ বেরোয়, তার কণ্ঠস্বর সেই রকম। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে বিশাখা দ্রুতবেগে উঠে দাঁড়ালো, দেয়ালে পিঠ দিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'স্মরজিৎ, তুমি যাও!' স্মরজিতের মুখের উপর তার চোখ পড়লো—সে-মুখ নীল হ'য়ে গেছে, চোখ দুটো ঘোলাটে, নিচের ঠোঁটটা শিথিল হ'য়ে ঝুলে পড়েছে—তারপর একবার তাকালো অসীমের দিকে—সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হ'লো যে আর তার উপায় নেই।

স্মরজিৎ বললে, 'যাচ্ছি—কিন্তু আর আমি ফিরবো না, এটা জেনে রাখো।' ফ্রেমে-আঁটা ছবির মতো মুহূর্তকাল দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো স্মরজিৎ, তারপর সৈনিকের মতো দ্রুত ভঙ্গিতে পিছন ফিরে দুমদাম শব্দে নেমে গেলো।

তখন গুপ্ত আপিশ যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, অমলা দেবী

কাছে দাঁড়িয়ে। স্মরজিৎ সোজা কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'শুনুন—'

তার চেহারা দেখে দু'জনেই চমকে উঠলেন।—'কী হয়েছে, স্মরজিৎ ?'

'আপনাদের কন্যার সঙ্গে আমার আর কোনো সংশ্রব নেই। ছেলেবেলা থেকে যে-সম্পর্কের দাবিতে আপনাদের সঙ্গে আমার বন্ধন, আজ থেকে তা ছিন্ন মনে করবেন। আমার আর খোঁজ-খবর নেবেন না আপনারা—আমি চললাম।'

গলা দিয়ে একটি আওয়াজ বের করতে পারলেন না গুপ্ত, একবার চোখের পলক ফেলতে পারলেন না, স্মরজিৎ তার আগেই তিন লাফে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলো—বজ্রাহত হ'য়ে ব'সে রইলেন তিনি, অমলা দেবী আঁচলে কয়েকবার মুখ মুছে একটা সোফায় এলিয়ে পড়লেন। একটু পরে ধীর গম্ভীর নিঃশব্দ পায়ে অসীমকে তেতলা থেকে নেমে আসতে দেখা গেলো। গুপ্তর দিকে একবার তাকালো অসীম, কিন্তু অসীমকে ডেকে গল্প করবার মতো মনের অবস্থা এখন তাঁর নয়—তিনি অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন। অসীম যাবার পর হঠাৎ তাঁর কী মনে হ'লো, তাড়াতাড়ি একজন চাকরকে ডেকে বললেন, 'ছাখ তো, অসীমবাবু চ'লে গেলেন নাকি। থাকলে এক্ষুনি ডেকে আন।'

চাকর ফিরে এসে বললে যে বাবু চ'লে গেছেন। তখন গুপ্ত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শাখাকে একবার ডাকো।'

ডাকতে হ'লো না, শাখা আস্তে-আস্তে নেমে এলো। ফোলা-ফোলা তার চোখ, মুখ এমন ফ্যাকাশে যেন কতকাল অসুখে ভুগে উঠেছে। মা-বাবার দিকে না-তাকিয়ে সে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলো, গুপ্ত বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকলেন, 'শাখা, এদিকে এসো।'

বিশাখা থমকে দাঁড়ালো।

'বোসো এখানে।'

কলে টেপা পুতুলের মতো বিশাখা বসলো।

'স্মরজিৎ চ'লে গেলো কেন ?'

'আমি জানি না।'

'কেন চ'লে গেলো ? কী হয়েছে ?···জবাব দাও কথার—বলো, কী হয়েছে ?'

'আমি কিছু জানি না।'

'তুমি জানো না মানে ? স্মরজিৎ এইমাত্র ব'লে গেলো যে তোমার সঙ্গে তার আর কোনো সংশ্রব নেই। কেন বললো এ-কথা ?'

'আমি জানি না।'

'তুমি জানো না তো কে জানে ?' গুপ্তর কণ্ঠস্বরে দেয়াল কেঁপে উঠলো। 'সে তোমার স্বামী—তোমার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি সম্পদ সার্থকতার উৎস—সে যদি আজ তোমাকে পরিত্যাগ করে তোমার উপায় হবে কী ?'

'তাও আমি জানি না।'

অত্যন্ত অধৈর্যের একটা ভঙ্গি ক'রে গুপ্ত বললেন, 'শাখা— একগুঁয়েমি কোরো না, কী হয়েছে তোমাকে বলতেই হবে!'

অমলা দেবী বললেন, 'শাখা, বল না।'

বিশাখা চুপ।

'তবু চুপ ক'রে আছো!'

স্বামীর মুখ-চোখ দেখে অমলা দেবী ভয় পেয়ে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আচ্ছা, আমাকে বল—'

'তুমি চুপ করো। আদর দেবার সময় এখন নয়!' চেয়ার ছেড়ে উঠে গুপ্ত অস্থিরভাবে পাইচারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তার চোখে চোখ ফেলতে চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর চোখ পড়লো অসীমের আঁকা সেই ছবিটার উপর। নিষ্পলক চোখে ছবিটা দেখছে বিশাখা। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুৎ যেমন নিমেষে অন্ধকার ছিড়ে দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে তোলে, তেমনি সমস্ত ব্যাপার গুপ্ত যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন। চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'শাখা!'

বিশাখা ছবি থেকে চোখ সরিয়ে আনলো।

'তোর মনে এই ছিলো! এই ছিলো!' যেন আপন মনেই গুপ্ত বললেন। অসহায়ের মতো একবার চারদিকে তাকালেন তিনি, তাঁর সুখের ভাণ্ডার, শান্তির আধার, উপার্জনের প্রতিবিম্ব এই বাড়ির কোনোখানেই কোনো আশ্রয় পেলো না তাঁর চোখ—

ঘর পার হলেন, বারান্দা পার হ'লেন, নিচু-নিচু চওড়া মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন—গাড়িতে উঠে ব'সে ছুটলেন স্মরজিতের কাকার বাড়ির উদ্দেশে।

ফিরে এলেন প্রায় ছু'ঘণ্টা পরে, বিশাখা ততক্ষণে স্নানাহারের অভিনয় সেরে নিজের ঘরে শুয়েছে। ড্রয়িংরুমে ব'সে অমলা দেবীর সঙ্গে নিচু গলায় কথা বললেন, ছু'একটা কথা বিশাখার কানে এলো—তার মধ্যে অসীমের নাম শুনলো একবার। বুঝলো, বাবা এক্ষুনি তার কাছে আসবেন, উঠে ব'সে প্রস্তুত হ'য়ে রইলো।

গুপ্ত এসে বললেন, 'স্মরজিতের কাছে সব শুনলাম।'

বিশাখা চুপ।

'তার কথা আমি বিশ্বাস করি—মিথ্যা সে বলে না। তবু তোমাকে জিগেস করি—সে যা দেখেছে বা শুনেছে তা কি সত্য নয়?'

সত্য নয়! বিশাখার বুক ফেটে একটা চীৎকার বেরিয়ে আসতে চাইলো। সত্য, সত্য! এ যে কত সত্য স্মরজিৎ তার কী জানে!

বিশাখার উত্তরের জন্য গুপ্ত মুহূর্তকাল অপেক্ষা করলেন।

'স্মরজিৎ বদ্ধপরিকর, তোমাকে আর গ্রহণ করবে না। যদিও তুমি আমারই কন্যা; তাকে দোষ দিতে পারি না আমি। আমিও আর তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছা করি না।' দৃঢ়, স্পষ্ট,

কঠোর স্বরে এই কথাগুলি ব'লে গুপ্ত বেরিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

গুপ্ত ভাবলেন তিনি কন্যার মৃত্যু-দণ্ড উচ্চারণ করলেন, কিন্তু বিশাখার কানে তা মুক্তির ঘোষণার মতো শোনালো। একটা উদ্দাম আনন্দে আলোড়িত হ'য়ে উঠলো তার সমস্ত বুক। হঠাৎ যেন তার চোখের সামনে কারাগারের দেয়ালগুলি দুর্বার বেগে ভেঙে-ভেঙে পড়তে লাগলো—আরামের দেয়াল, অভ্যাসের দেয়াল, ভব্যতার দেয়াল, শাড়ি-গয়নার দেয়াল, ইংরেজি উচ্চারণ ফরাশি ব্যাকরণ শেলাই রবীন্দ্র-সংগীত চা-পার্টি সিনেমা পিকনিকের দেয়াল, ন'বছর বয়স থেকে একজনের স্ত্রী হবার জন্য নিজেকে ছাঁচে ঢালবার দেয়াল। আজীবন এই কারাদণ্ডের আদেশ নিয়ে জন্মেছিলো সে, শৃঙ্খলকেই ভেবেছিলো রমণীয়, বন্ধনকেই জেনেছিলো আশীর্বাদ—যে-মুহূর্তে জানলো এটা কারাগার, সে-মুহূর্তেই মুক্ত হ'লো। আজ সমস্ত পথ তার খুলে গেছে। স্মরজিৎ তাকে গ্রহণ করবে না, বাবাও তাকে পরিত্যাগ করলেন—আজ আর তার ভয় কিসের।

প্রথমেই মনে হ'লো অসীমকে একটা চিঠি লেখে। মনে-মনে চিঠিটা রচনা করতে লাগলো, কিন্তু ভালো ক'রে কিছুই ভাবতে পারলো না। সে যে বেঁচে গেছে, এই আশ্চর্য কথাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসই হ'লো না তার। নিশ্চিতের মুঠি থেকে খ'সে ভবিষ্যতের দারুণ তরঙ্গের মধ্যে সে পড়লো কেমন ক'রে?

চোখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে-শুয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে বিশাখা শুধু এই কথাটিই ভাবলো যে অসীমকে সে ভালোবাসে। সমস্ত দেহ দিয়ে ভাবলো কথাটি, সমস্ত বুক ভ'রে ভাবলো, এ-কথাটি ভাববার আর যে তার কোনো বাধা নেই, এই আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ভাবলো। আকাশ গানে ভ'রে উঠলো, বাতাসে সুর, নিশ্বাসে মীড়। এ-গান যার জেগেছে সে-ই তো জানে গান। এ-গান যে জানে না, সে কেন গলা দিয়ে গান গায়?

আর না—আর দেরি ক'রে লাভ কী—অসীমকে লিখে দেবে এখুনি চ'লে আসতে। বিশাখা লাফিয়ে উঠে বসলো বিছানার উপর। কিন্তু চিঠি পাঠাবে কাকে দিয়ে? ভাইদের কাউকে দিয়ে? চাকরকে দিয়ে? এ-বাড়িতে বাবার বিরুদ্ধতা ক'রে তার বন্ধু হবে কে? কেউ না। মা? মা তো বাবারই ছায়া। বাবার ইচ্ছাই এ-বাড়ির আইন—তিনি আর তার মুখ দেখতে চান না, তাই সকলেই তাকে দেখে শিহরিত হবে। এ-বাড়ি থেকে লুকিয়ে কোনো চিঠি পাঠানো? অসম্ভব।

কেন, ডাকে দিলেই হয় চিঠি। কিন্তু পেতে দেরি হবে, অতক্ষণ সে থাকবে কেমন ক'রে। এখনই, এই মুহূর্তে অসীমকে তার চাই। চিঠি লিখতেই বা হবে কেন, সে তো আসবেই, এখনই কেন আসে না? সবই তো জানে সে, তবে আসে না কেন? কোথায় আসবে? এইখানে? এই বাড়িতে?

হ্যাঁ, তা-ই আসবে ; সে-ই না বড়ো সাহসের কথা, শক্তির কথা বলছিলো ? কিন্তু সে-সাহস, সে-শক্তি বিশাখা কি তাকে দিয়েছে ? সে তো পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়েছিলো—অসীম সমস্তটা জেনে যায়নি, জেনে গেছে যে বিশাখা দুর্বল, সে দয়া চায়, রক্ষা পেতে চায়। নিজের উপর অসীমের দয়া নেই, তাই বিশাখাকে দয়া করতে সে কাতর হবে না। যদি তা-ই হয় ? যদি তা-ই করে ? হঠাৎ একটা আতঙ্কের ধাক্কায় বিশাখার হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হ'য়ে গেলো। তাই তো, কী ভাবছিলো সে এতক্ষণ ! অসীম তো আর আসবে না, সে যদি কোনোরকমে একটা চিঠি পাঠাতেও পারে, তাহ'লেও না—তার মুখের কথাই রাখবে সে, তাকে সে ক্ষমা করবে, রক্ষা করবে, বাঁচাবে ! নিজে থাকবে পাষাণ হ'য়ে, আর সেই পাষাণ হবার মূল্য উপহার দেবে বিশাখার জীবনকে ! না, তা নয়—তার মূল্য নেবে বিশাখার জীবন !

তবে কি অসীমও তাকে পরিত্যাগ করলো ?

বিশাখার কপাল ঘেমে উঠলো, সে যেন আর নিশ্বাস নিতে পারছে না। খাট থেকে নেমে জানালায় দাঁড়ালো। বাইরে তাকিয়েই ইচ্ছে হ'লো ছুটে রাস্তায় চ'লে যায়। একদিন আগেও সে যখন খুশি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেখানে খুশি যেতে পেরেছে—আজ সে কিছুই পারে না। বাড়ির সামনের এই রাস্তা দিয়ে বিশাখা জীবনে কখনো হাঁটেনি—তার একলার জন্যেই ছোটো গাড়ি ছিলো একখানা—যারা হেঁটে বেড়ায় তাদের সে

করুণার চোখেই দেখেছে বরাবর। আজ তার মনে হ'লো যে যারা পায়ে হাঁটে তারাই সুখী, কোনো আয়োজন করতে হয় না তাদের, অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় না, যখন ইচ্ছে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লেই হ'লো। কিন্তু লোকের চোখে না-প'ড়ে সে কি রাস্তায় বেরোতে পারবে? সে তো সাধারণ একটি মেয়ে নয়; সে এইচ. আর. গুপ্টার কন্যা, একজন আই. সি. এস.-এর—একজন আই. সি. এস.-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিলো। আর বেরোতে পারলেও তো পথ চিনে যেতে পারবে না—অসীমের বাড়িতে দু'দিনই মাত্র সে গিয়েছে, তাও রাত্তিরে, আর জন্ম থেকে গাড়ি চ'ড়ে-চ'ড়ে পথ-ঘাট সম্বন্ধে তার একেবারেই ধারণা নেই।

তাহ'লে? কী উপায়?

ঘরটা যেন ছোটো হ'য়ে গেছে, দেয়ালগুলো তাকে চেপে ধরেছে, পৃথিবীতে বাতাস যেন কম। এখান থেকে তাকে বেরোতেই হবে—নয়তো সে বাঁচবে না। যাবে কোথায়? এ-ঘর থেকে বেরোতে হ'লেই তাদের কাছে মুখ দেখাতে হয়, যারা আর তার মুখ দেখতে চায় না। তাহ'লে কি এই ঘরেই আবদ্ধ হ'য়ে কাটাতে হবে সারা জীবন? না, না, তা হ'তে পারে না। স্মরজিৎকে বাদ দিয়ে, বাবাকেও বাদ দিয়ে, তার তো একটা অস্তিত্ব আছে। তাকে তো বেঁচে থাকতে হবে। কী করবে সে? কী হবে তার? কী হবে? কী করবে?

কী আবার করবে—অসীম থাকতে তার আবার ভয় কী। কিন্তু অসীম কোথায় ? সে কি আছে ? ঐ তেতলার স্টুডিওতে সকালবেলার দু'ঘণ্টা—এই ভাবেই যদি চলতো চিরকাল ! ওতেই সে ভ'রে ছিলো, ওর বেশি সে চায়নি। না, চেয়েছে। সে চায়, সমস্তটাই চায়। কিন্তু পাবে কি ? পাবে কি ? না তো ! তার যে একবার বিয়ে হ'য়ে গেছে, অসীমকে সে তো কখনো পাবে না। কোনো হিন্দু মেয়ের কি দু'বার বিয়ে হয়, স্বামী ত্যাগ করলেও ? কেন অসীমের সঙ্গে তার আগে দেখা হয়নি, কেন সে বিয়ে করেছিলো, কেন অপেক্ষা করেনি, কেন এই ভুল করলো ?

বিশাখার মনে হ'লো আর তার দাঁড়াবার শক্তি নেই। আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো, মাথার উপর ইলেকট্রিক পাখাটা ঘুরছে, দেয়ালের গায়ে লেগে আছে একটা মোটা ফর্শা নিঃসাড় টিকটিকি, আর তার ঠিক পাশেই ছোটো একটি রামধনু জ্বালিয়ে দিয়েছে আয়না-ছোঁওয়া বাঁকা রোদ্দুর। এ-রামধনু এক্ষুনি মিলিয়ে যাবে, মিলিয়ে গেলো ব'লে। সে যদি উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটাকে একটু তুলে দেয়, কি একটু নামিয়ে দেয়, তাহ'লেই রামধনু আর থাকবে না। কত সহজ ! অথচ সে ইচ্ছে ক'রে শুয়ে আছে, আর রামধনু এমন নিশ্চল যেন চিরকাল ওখানেই থাকবে। ওদিক্ থেকে চোখ সরিয়ে নিলো বিশাখা, তাকালো আকাশের

দিকে, যে-আকাশ চিরন্তন।' না, কোনো উপায় নেই তার। তাকে মরতে হবে।

অত্যন্ত সহজ, শান্ত ভাবে বিশাখা এ-মীমাংসায় পৌঁছলো। মানুষ যতক্ষণ স্বপ্ন দেখে স্বপ্নটাকেই সত্য মনে হয়, কিন্তু যে-মুহূর্তে জেগে উঠে চিরপরিচিত বাস্তব জগৎকে দেখতে পায়, সেই মুহূর্তেই স্বপ্ন ভুলে গিয়ে সেই বাস্তকেই একান্ত সত্য ব'লে গ্রহণ করে। তেমনি বিশাখাও এতক্ষণ নানা দ্বন্দ্বে সংশয়ে সমস্যায় অভিভূত হ'য়ে ছিলো, যে-মুহূর্তে মৃত্যুর কথা মনে হ'লো, সঙ্গে-সঙ্গে সে-সমস্ত মিলিয়ে গেলো শূন্যে, মৃত্যুকেই জানলো পরম সত্য ব'লে। স্মরজিতের কাছে আর তার ফিরে যাবার কথাই ওঠে না, স্মরজিৎ চাইলেও না; বাবার ঘৃণা আর ভাইদের অবজ্ঞা সহ্য ক'রে এখানে সে থাকতে পারবে না; অসীমকে পাবার কোনো আশা তার নেই। আর আজ থেকে এ-বাড়িতে আর স্মরজিতের বাড়িতে যে-একটা তিক্ততা, বিক্ষোভ, অশান্তির সূত্রপাত হ'লো, এ কি সহজে থামবে? আস্তে-আস্তে ছড়াবে দু'বাড়ির আত্মীয়-বন্ধু মহলে, এ নিয়ে তর্ক হবে, হাসাহাসি হবে, রেষারেষি হবে, তারপর ছড়াবে সমস্ত শহরে, সমস্ত বাংলা দেশে একটা চমকপ্রদ খবর হ'য়ে। ভালোবাসার সে-অসম্মান সে সইবে কেমন ক'রে? না—বিশাখা ভেবে দেখলো মৃত্যু ছাড়া তার পথ নেই।

সত্যি কি মরবে? ম'রে গেলে আর তো আশা নেই।

এমনিতেই বা কী-আশা আছে তাঁর? দেহের অস্তিত্বই তো জীবন নয়। স্নেহ ভালোবাসা সম্মানের সিংহাসনে যারা তাকে বসিয়েছিলো, সেই সব আত্মীয়-স্বজন বন্ধুদের কাছে অবহেলা অনাদর নির্যাতন বিদ্রূপ ছাড়া আর-কী তার প্রাপ্য হ'তে পারে এখন? বাবা কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবেন না তাকে, উনিশ বছর ধ'রে এ-বাড়িতে যে-গৌরব সে ভোগ ক'রে এসেছে তা সে চিরকালের মতো হারিয়েছে। দিনের পর দিন যাবে, তারপর অসীমও ভুলবে তাকে—বিছিন্ন হ'লে এ-আবেগ কতদিন আর থাকবে তার। সে যুবক, সে অবিবাহিত, সে স্বাধীন, তার সামনে শিল্পীজীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—কোনো-একদিন আবার কোনো-একটি মেয়েকে তার ভালো লাগবে, তাকে বিয়ে করবে, সুখী হবে, সম্পূর্ণ হবে। আর তখন, তারপরেও কি বিশাখাকে বেঁচে থাকতে হবে?

মনে পড়লো অসীমের চোখ, তার মুখ, তার কণ্ঠস্বর। আর কি কখনো দেখবে না তাকে? দেখবার তীব্র ইচ্ছায় সে জ্ব'লে-জ্ব'লে মরবে প্রতিদিন, অথচ কখনো দেখতে পাবে না? দিনে-দিনে এই মৃত্যুর চাইতে চিরদিনের মৃত্যুই কি ভালো নয়? নিশ্চয়ই ভালো—এই যে বুকের দেয়ালের মধ্যে তার হৃৎপিণ্ড পাগলের মতো আকুলিবিকুলি করছে, একে শান্ত করবার আর তো কোনো উপায় তার জানা নেই। থামিয়ে দেবে, ঐ যন্ত্রকে, তারপর—আর কী। কিন্তু তার এই

রাশি-রাশি ইচ্ছার, ইচ্ছার এই দুরন্ত বেগের, ভালো লাগার এই প্রচণ্ড শক্তির কী হবে? ইচ্ছা তো দেহের মতো একটা বস্তু নয়, দেহের সঙ্গে-সঙ্গে তার যদি শেষ না হয়? কিন্তু দেহ আছে ব'লেই তো দুঃখ—দেহ থেকে মুক্ত হ'য়ে তার ইচ্ছা যদি আকাশে বাতাসে মেঘে বৃষ্টিতে নদীতে অরণ্যে মিশে যায় তো যাক—সে তো থাকবে না, তাই দুঃখও পাবে না। মরলে মানুষের কী হয়? কী হয় জানে না, কোথায় যায় জানে না, কিন্তু মানুষ যে থাকে না, এইটেই শান্তি।

এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে অমলা দেবী ঘরে ঢুকলেন। আজ আর তাকে সকলের সঙ্গে ব'সে চা খেতে ডাকা হ'লো না; তার জাত গেছে, তার সব গেছে।

'বড়ো ভয়ানক সব কথা শুনছি।'

বিশাখা চুপ ক'রে রইলো।

'আজকাল অবশ্যি ঘরে-ঘরেই এ-সব কাণ্ড হচ্ছে—তবে বিয়ের পরে কিনা, তাই মুশকিল। আর তোমার বাবা এ-সব একেবারেই পছন্দ করেন না—বিয়ের আগেও না।'

বিশাখা মাথা নিচু ক'রে সিঁথির উপর দিয়ে একটি আঙুলের ডগা বুলিয়ে গেলো।

'আমি বলছিলাম কী—কয়েকদিন পরে তোমার বাবা তোমাকে নিয়ে খুলনা যান—ছেলেবেলা থেকে দেখছে, কাছে গেলে কি আর ফেলতে পারবে!'

বিশাখা এক চুমুক চা খেলো।

'আর ও-সব···ও-সব কিছু না। ছেলেবয়সে কত হয় ও-রকম, ও নিয়ে ভাবতে হ'লেই হয়েছিলো!'

মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে বিশাখা ভাববার চেষ্টা করলো যে কোনো বয়সে কোনো সময়ে কোনো মানুষের প্রতি এ-রকম তাঁর হয়েছিলো কিনা। না, সে-আলো তাঁর মুখে নেই, সে-সুর তাঁর কণ্ঠে নেই।

'না-হয় তুমিই স্মরজিৎকে একবার—'

'মা, চুপ করো।'

'চুপ ক'রে থাকবার কথা এ তো নয়, শাখা, এ হ'লো জীবন-মরণের কথা—'

ঠিক! হয় জীবনের, নয় মরণের।

'কী অবস্থা বাড়ির!' অমলা দেবী বলতে লাগলেন, 'তোমার বাবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেন বুড়ো হ'য়ে গেছেন, ছেলেগুলো চোরের মতো পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আর আমার সেই হার্টের ব্যথাটা অনেকদিন পর—' একটু যেন কষ্টে নিশ্বাস নিয়ে তিনি কথা শেষ করলেন, 'এর একটা বিহিত হওয়া চাই তো।'

বিশাখা জিগেস করলো, 'মা, তুমি সেই হার্টের ওষুধটা খাও না আজকাল?'

'কে জানে কোথায় আছে ওষুধ, আর এখন কাকেই বা আনতে বলি—কিছু ভালো লাগছে না।'

রাত্রে অমলা দেবী মেয়ের কাছে শুলেন। জলের সঙ্গে মিশিয়ে তু'ফোঁটা ওষুধ খেলেন শোবার আগে।—'এটা খেয়ে নিই, নয়তো ঘুমুতে পারবো না।'

'কোথায় পেলে ওষুধ ?'

'ছিলো একটা অনেকদিন আগেকার।'

'কী হয় ওষুধ খেয়ে, আবার তো ব্যথা হয়।'

'হাটের অসুখ সারে না—তখনকার মতো আরাম হওয়া দিয়েই কথা।'

'ওষুধটা যদি বেশি ক'রে খাও তাহ'লে সারে না ?'

'ওরে বাবা, তাহ'লে একেবারে চিরনিদ্রা !'

বিশাখা নিশ্চিন্ত হ'য়ে মা-র পাশে শুয়ে পড়লো। মৃত্যুর পথ জানা ছিলো না তার, সে-পথ নিজে এসে ধরা দিলো। মৃত্যু তাকে নেবে ব'লে হাত বাড়িয়েছে ; সে যাবে, যাবে—আর বেশি দেরি নেই। মা ঘুমিয়ে পড়া মাত্র ওষুধের শিশিটি নিয়ে নিজের বালিশের তলায় রাখলো, তারপর শুয়ে-শুয়ে জেগে-জেগে যে-দেহ তার থাকবে না সেই দেহ সমর্পণ করলো অসীমকে, যে-আত্মা তার অমর সেই আত্মাও উৎসর্গ করলো তাকে, মন দিলো তাকে, প্রাণ দিলে তাকে, মৃত্যুর মুহূর্তে জীবনের যে-পূর্ণতা, সেই পূর্ণতা তাকে দিলো।

তখন অসীমের চোখেও ঘুম ছিলো না। সারাদিন সে অনর্থক ঘুরে বেড়িয়েছে সমস্ত শহর, অনেক রাত্রে ক্লান্ত হ'য়ে

বাড়ি ফিরেও ঘুমুতে পারছে না। সে-ই ভুল করেছে, সকালবেলা তক্ষুনি চ'লে আসাটা ভুল হয়েছে তার। বিশাখাকে ওরা কী বলেছে? কী করেছে? সারাদিন ধ'রে নিজেকে সে যতই বুঝিয়েছে যে এ-ব্যাপারে তার কোনো সংযোগ নেই, এটা নিতান্তই স্বামী-স্ত্রীর একটা ঘরোয়া ঝগড়া, সব স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মতোই একটু পরে আপনি মিটে যাবে, সে এর মধ্যে কিছু করতে গেলে ভালো তো হবেই না, বরং স্বামী-স্ত্রীর মিলনের অন্তরায়ই হবে সেটা, আর সেইজন্য নিজেকে এখন একেবারে মুছে ফেলাই তার কর্তব্য—যতই এ-সব ব'লে নিজেকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা সে করেছে, ততই তার মনের গভীর অতল থেকে এই কথাই বার-বার শুনতে পেয়েছে যে সে ভুল করছে, সে ভুল করেছে। এটা তারই ব্যাপার, এ-ব্যাপারে সে কিছু না-করলে কেউ কিছু করতে পারে না। ও-বাড়িতে যাতে সে না যায়, যাতে ও-বাড়ির মোড়ে হঠাৎ ট্র্যাম থেকে নেমে না পড়ে, তার জন্য নিজেকে সে চাবুক মেরেছে সারাদিন। কিন্তু নির্ঘুম রাত্রিতে ছটফট করতে-করতে সে বুঝতে পারলো যে তার এই দূরে স'রে থাকাটা অন্যায়, নিজের প্রতি, বিশাখার প্রতি, অন্য সকলের প্রতি অন্যায়। যেমন ক'রে মানুষ নিজের সুখদুঃখ অনুভব করে, তেমনি স্পষ্ট ক'রে আপন বুকের মধ্যে সে অনুভব করলো যে বিশাখা এখন তাকে চাইছে, তাকেই খুঁজছে, তাকে না-পেলে বিশাখার উপায় নেই। এক্ষুনি, এক্ষুনি তার যাওয়া চাই, আর

দেরি হ'লে হয়তো বড়োই দেরি হ'য়ে যাবে। অসীম উঠে আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখলো—মাত্র দুটো! ঘরে টিকতে পারলো না, দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে মাথার চুল টানতে-টানতে পাইচারি করতে লাগলো। তার যেন মনে হ'লো এই মুহূর্তে বিশাখা তাকে ফেলে দূর দূরান্তরে চ'লে যাচ্ছে, সে তাকে রাখতে পারলো না, বাধা দিতে পারলো না, এর পরে বুক ফেটে মরলেও তাকে আর পাবে না সে। অন্ধকারে দু'হাত বাড়িয়ে ডেকে উঠলো, 'বিশাখা!' সে-ডাক ফুটপাতের ঘাস থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বে হা-হা ক'রে ফিরতে লাগলো—কোথাও কোনো উত্তর পেলো না।

একটু ভদ্ররকমের ভোর হওয়া মাত্র সে একটু ভদ্ররকমের চেহারা ক'রে বেরিয়ে পড়লো। রাত্রে গুপ্তরও ভালো ঘুম হয়নি—জীবনে এই প্রথম তাঁর অনিদ্রারোগ—সকাল-সকাল উঠে বারান্দায় ব'সে ছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে অসীমকে উঠে আসতে দেখে তিনিও উঠে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালেন গিয়ে। দু' সিঁড়ি আগে মুখ তুলে অসীম বললে, 'নমস্কার, মিস্টর গুপ্ত।'

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে গুপ্ত বললেন, 'তুমি এলে, ভালোই হ'লো। এসো।'

'আপনি কি ভেবেছিলেন আমি আর আসবো না?'

'কালকের দিনের মধ্যে অনেক কথাই ভেবেছি।' বারান্দায় এনে তাকে বসিয়ে গুপ্ত বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'সব শুনবো। কিন্তু বিশাখা' কোথায়? তাকে একবার ডেকে দিন।'

গুপ্ত স্তম্ভিত হ'য়ে অসীমের মুখের দিকে তাকালেন। এত নির্লজ্জ অসীম! হিমালয়তুল্য গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, 'তার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না।'

'কেন?' অসীম এমনভাবে প্রশ্ন করলো যেন গুপ্ত তার কোনো অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন।

'কেন, জিগেস করছো? তোমার লজ্জা নেই?'

'না, লজ্জাকর আমি কিছু করিনি। তাকে একবার ডেকে দিন, আমি এইখেনে আপনার সামনে ব'সে তাকে একটা কথা বলবো। আমাকে বিশ্বাস করুন, এতে কোনো ক্ষতি হবে না, এতে ভালোই হবে।'

'না। তুমি জানো, স্মরজিৎ আমার কন্যাকে আর গ্রহণ করতে চাচ্ছে না?'

'আমি সেইরকমই ভয় করছিলুম।'

'তুমি জানো যে এ-জন্য তুমিই দায়ী?'

'আমি উপলক্ষ্য, কিন্তু আমাকে যদি দায়ী হ'তে বলেন—আমি তা-ই হবো।'

'একটা জীবন তুমি নষ্ট করলে, অনেকগুলি জীবনে অশান্তি আনলে—এর জন্য তোমার কী-শাস্তি হ'লে ঠিক হয়? তোমাকেই জিগেস করছি।'

'আপনাকে জিগেস করছি, শাস্তি আমাকে দেবে কে ?—কিন্তু এ-সব আলোচনার পরে অনেক সময় পাবো, মিস্টর গুপ্ত, এখন ওকে ডেকে দিন', অসীমের কণ্ঠস্বরে গভীর ব্যাকুলতা ফুটে উঠলো।

গুপ্ত একটু ভেবে বললেন, 'তুমি তাহ'লে ওর সামনেই শাস্তি নেবে ?'

'তা-ই নেবো।'

'ওর সামনেই শপথ ক'রে বলবে যে ও-সব তোমার মনের বিকার ?'

অসীম অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে, 'হবে, হবে, সব হবে। আপনি ওকে আসতে বলুন।'

গুপ্ত একজন চাকরকে ডেকে বললেন, 'মা-কে বল তো দিদিমণিকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিতে।' তারপর অসীমের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'ছেলেমানুষ—কিছু বোঝে না—ওর জীবনটা নষ্ট হ'তে দিয়ো না তুমি।'

'আমার কাছে আপনি কী আশা করেন ?'

'না, না, কিছু আশা করার কথা নয়—তবে কিনা, তুমি যদি একটু বুঝিয়ে বলো—আমাদের কথার চাইতে তোমার কথাতেই কাজ হবে এখন।'

দ্রুত দৃষ্টিতে একবার গুপ্তর দিকে তাকিয়ে অসীম বললে, 'আচ্ছা, আসুক তো।'

কিন্তু বিশাখার আসতে কেবলই দেরি হ'তে লাগলো।

অমলা দেবী ঘরে গিয়ে দেখলেন, মেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। দু'চারবার ডেকে সাড়া পেলেন না। তখন গায়ে ধাক্কা দিতে-দিতে ডাকলেন, 'শাখা, শাখা—ওঠ!'

বিশাখা জড়িতস্বরে বললো, 'উঁ?'

'ওঠ, ওঠ,' অমলা দেবী গলা চড়ালেন, 'তোর বাবা তোকে ডাকছেন—'

বিশাখা চোখ মেলে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। এ কী? তার মা! সেই ঘর! সে কি তাহ'লে মরেনি? নিজের কপালের উপর একবার হাত রাখলো, হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকালো একবার। সে বেঁচে আছে! তাড়াতাড়ি বালিশের তলায় হাত দিলো—ওষুধের শিশিটা তেমনিই প'ড়ে আছে। হায় হায়, সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, সে মরতে পারেনি, আরো একটা দিন এই অসহ্য জীবন তাকে বহন করতে হবে!

অমলা দেবী গলা নিচু ক'রে বললেন, 'ওঠ, তোর বাবা তোকে বারান্দায় ডাকছেন—অসীম এসেছে।'

কে! আর-একটু হ'লেই বিশাখা চেঁচিয়ে উঠেছিলো। অসীম এসেছে! কী ভাগ্য সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, কী ভাগ্য সে ওটা খায়নি! দ্রুত বেগে সে বালিশের তলা থেকে শিশিটা বের ক'রে বললে, 'এই ছাখো! তোমার ওষুধটা বিছানাতেই প'ড়ে আছে! এটা কোনো ভালো জায়গায় রেখে দাও, মা, নয়তো আবার দরকার হ'লে খুঁজে পাবে না।'

শেষরাত্রির দিকে কয়েকটা ঘণ্টা সে বোধহয় ভালোই ঘুমিয়েছিলো, ঝরঝরে লাগছিলো শরীর। আজকের মতো ভোরে খুব কম দিনই সে ঘুম থেকে উঠেছে, এ তার নতুন লাগলো। নতুন লাগলো পৃথিবী, নতুন লাগলো নিজেকে। কাল রাত্রে খুব সম্ভব সে ম'রেই গিয়েছিলো, ম'রে গিয়ে আবার বেঁচেছে—এ তার নতুন জন্ম, এ তার নবজীবন। মৃত্যু খুব কাছে এসেছিলো কাল; হাত বাড়িয়েছিলো, হয়তো ঘুমের মধ্যে নিয়েও গিয়েছিলো তাকে, আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেলো। কেন ফিরিয়ে দিলো? আজ সকালে ঘুম না-ভাঙতেই অসীম আসবে ব'লে। মৃত্যুর মধ্যে অসীমেরই সে হয়েছিলো, তাই তো আজ ভোর হ'তেই সে এসেছে। বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখ দেখে বিশাখা ভাবলো যে তার নাম একই আছে, চেহারা একই আছে, কিন্তু সে আর সে নেই, সে আর-একজন, সে সদ্যোজাত—পুরোনো কোনো দাবিই তার উপর আর চলবে না।

তাড়াতাড়ি মুখ-চোখ ধুয়ে পরিষ্কার একটি শাড়ি প'রে বিশাখা বারান্দায় এলো। গুপ্ত মেয়েকে দেখে অবাক হলেন—তার চোখ-মুখ ঝলমল করছে। অসীম তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেমন আছো, বিশাখা?'

'ভালো আছি। তুমি—' বিশাখার মুখে অত্যন্ত সহজে 'তুমি' এসে পড়লো, আর সে-জন্য একটুও অপ্রতিভ হ'লো না সে। অতীত মুছে গেছে, আজ সব নতুন ক'রে আরম্ভ। তবু, যেন

জগৎ-সংসারকে অনুগ্রহ ক'রে 'তুমি'টাকে চাপা দিয়ে সে বললে, 'আপনি কখন এলেন ?'

গুপ্ত বললেন, 'শাখা, তোমাদের দু' জনের সামনেই একটা কথা বলবো ব'লে তোমাকে ডেকেছি। তোমার ভবিষ্যৎ কোন পথে যাবে তার মীমাংসা এখনই হওয়া চাই তা তুমি নিশ্চয়ই বোঝো ?'

'কী ভেবেছো তুমি ?'

'স্মরজিতের মনে তোমার সম্বন্ধে যে-সন্দেহ ঢুকেছে সেটা অমূলক প্রতিপন্ন করতে হবে। আর অসীমের সম্বন্ধে তোমার ধারণা যে ভুল সেটাও তোমার জানা দরকার।'

কথার প্রথমার্ধ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ না-ক'রে বিশাখা বললে, 'কী ধারণা আমার ?'

'সেটা অসীমের মুখেই শোনো। বলো, অসীম।'

অসীম বললে, 'কী আপনি শুনতে চান ?'

গুপ্ত একটু চেষ্টা ক'রে বললেন, 'ওর সম্বন্ধে তোমার মনে যেটা আছে সেটা যে সামান্য একটা মোহ মাত্র—'

কথার মাঝখানে অসীম ব'লে উঠলো, 'না, সেটা সামান্যও নয়, মোহও নয়। মিস্টর গুপ্ত, আপনার কন্যাকে আমি ভালোই বাসি।'

'ভালোবাসো !' গুপ্ত জ্ব'লে উঠলেন। 'ওর জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলে—এই তোমার ভালোবাসার নিদর্শন !'

'ব্যর্থ আমি করিনি, ব্যর্থ করেছেন আপনারা, আর আপনাদের জামাতা।'

'কিন্তু সে যা দেখেছে, যা শুনেছে—তার পর এ ছাড়া আর-কী সে করতে পারতো? সে যদি অনুভব করে যে তার স্ত্রীর মন তার উপর নেই, এমনকি, তারও বেশি কিছু—'

'সে-কথা আপনার কন্যাকেই জিগেস করুন।'

কন্যার দিকে একবার তাকিয়েই গুপ্ত চোখ সরিয়ে নিলেন।—'ওর কথা পরে শুনবো। তুমিই বলো না, এ-অবস্থায় ওকে কী করতে বলো?'

'আপনি নিজেকে বিচারকের আসনে বসিয়েছেন—আপনার বিচারের ফলাফল আগে শুনি, তারপর মনস্থির করবো।'

এর উত্তরে গুপ্ত কী বলবেন চট ক'রে ভেবে পেলেন না। যে-তেজ নিয়ে এ-আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন, সেটা যেন ভিতরে-ভিতরে এরই মধ্যে স্তিমিত হ'য়ে গেছে। স্ত্রীকে কাছে দেখে বললেন, 'একটু চা পাঠিয়ে দাও তো আমাদের।'

অমলা দেবী তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, 'একজন লোক এইমাত্র দিয়ে গেলো এটা। ছাখো তো কার।'

টাইপ-করা চিঠি, অত্যন্ত গদ্য চেহারা, কিন্তু পড়তে-পড়তে ঝকঝকে হ'য়ে উঠলো গুপ্তর চোখ-মুখ, দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো। স্মরজিতের চিঠি। লিখেছে যে ভেবে দেখলো এ-রকম ঘটনার সূত্র ধ'রে একটা স্ক্যাণ্ডল দেশময় ছড়িয়ে পড়ে—আর যদিও সে এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ, শুধু নির্দোষ নয়, অন্যায়ের ভুক্তভোগী, তবু কোনো-একটা স্ক্যাণ্ডল-এর সঙ্গে

নিরপরাধভাবেও নিজেকে জড়াতে সে ইচ্ছা করে না, সেটা তার উচ্চ রাজকার্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই সে শাখাকে ক্ষমা করতে এবং গ্রহণ করতে প্রস্তুত, আশা করা যায় যে তার এই মহানুভবতাকে কেউ দুর্বলতা ব'লে ভুল করবে না। তার আইনত বিবাহিত স্ত্রী যেন আজ সকাল ন'টার মধ্যেই তাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছয়—প্রস্তুত হ'তে যতক্ষণ লাগে তার বেশি এক মুহূর্ত সময়ও সে আর পিত্রালয়ে থাকে এ স্মরজিতের ইচ্ছা নয়—পূর্বব্যবস্থামতো কাল সে স্ত্রীকে নিয়ে কর্মস্থলে যাত্রা করবে। তলায় এস. দাশের একটা দর্পিত নাম-সই।

চিঠির সবটা ভালো ক'রে না-প'ড়েই গুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শাখা, স্মরজিৎ তোকে যেতে লিখেছে—এক্ষুনি যেতে লিখেছে। ওঠ, ওঠ, চটপট তৈরি হ'য়ে নে। রামদীন, বড়ো গাড়ি বের করো—আমি নিজেই যাবো তোকে নিয়ে—' গুপ্ত উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, 'ওগো—শাখাকে একটু খাইয়ে-টাইয়ে দাও—জিনিশপত্রের হাঙ্গামা এখন কোরো না, পরে পাঠিয়ে দিলেই হবে—আর হ্যাঁ', দেখতে-দেখতে গুপ্তর উৎসাহ তাঁর স্বাভাবিক মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেলো—'স্মরজিতের জন্য কিছু খাবার-টাবার—এখন আবার তৈরি করতে বোসো না, দেরি হ'য়ে যাবে—কিছু চীজ, সসেজ আর টিনের মাছ আনিয়ে নাও চট ক'রে—ও-সব ও ভালোবাসে খুব—আর ছাখো, সে বাঁড়ুয্যের দোকানে টেলিফোন ক'রে দাও—সবচেয়ে ভালো

তাঁতের ধুতি দু'খানা পাঠিয়ে দিতে—না; না, চারখানাই বলো—ওর বাপ আছে, খুড়ো আছে—তাই তো বলি, স্মরজিৎ সোনার ছেলে, ও কি কখনো—' এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা ব'লে গুপ্ত হঠাৎ নিশ্বাস নিতে একটু থামলেন, অসীমের উপর চোখ পড়ামাত্র বললেন, 'আচ্ছা অসীমবাবু, আপনি তাহ'লে—'

'আমাকে দিয়ে আপনার আর দরকার নেই, মনে হচ্ছে?' অসীম ক্ষীণ হাসলো।

'না, না, দরকারের কথা কী—বসুন, বসুন, একটু চা তো খাবেন।' হঠাৎ অসীমের পাশে ব'সে প'ড়ে ঘনিষ্ঠভাবে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু মাঝে-মাঝে আসতে হবে, অসীম—এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিলে চলবে না।'

'নিশ্চয়ই আসবো,' অসীমের মৃদুকণ্ঠ হঠাৎ একটু চড়া শোনালো।

'আমি আসছি এক্ষুনি—পালিয়ো না আবার।' গুপ্ত লাফ দিয়ে উঠলেন, ছুটে ঘরে গেলেন, ঘর গমগম করতে লাগলো তাঁর একটানা উচ্চস্বরে—নানারকম নির্দেশ দিচ্ছেন চাকরদের।

স্মরজিতের চিঠিটা তুলে নিয়ে বিশাখা পড়তে লাগলো, অসীম নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে। পড়তে-পড়তে একটা গভীর লাল রং ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে; গাছ থেকে যেমন শুকনো পাতা ঝ'রে পড়ে, তেমনি চিঠিটা খ'সে

পড়লো তার হাত থেকে। অসীম তার মুখ থেকে চোখ সরালো না, আর তার চোখ অসীমের চোখের উপর পড়তেই হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালো বিশাখা। সঙ্গে-সঙ্গে যেন কিছু বুঝতে পেরে অসীমও উঠলো, রুদ্ধস্বরে বললে, 'তাহ'লে—?'

বিশাখা বললো, 'চলো।'

'আমি প্রস্তুত,' অসীমের চোখে একবার পলক পড়লো না। 'কিন্তু তোমার কি ভয় করছে না?'

'না।'

'ভেবে দেখেছো এর মানে কী?'

'আর কথা না,' বিশাখা দ্রুত দৃষ্টিতে একবার এদিক-ওদিক তাকালো। 'চলো—সময় নেই।'

ঘরের মধ্যে গুপ্তর কণ্ঠস্বর স্রোতের মতো ব'য়ে যেতে লাগলো অবিরাম। স্ত্রীর উপর তাঁর বেশি আস্থা নেই, সমস্ত ব্যবস্থা নিজে করলেন, আর ভাবতে লাগলেন যে স্মরজিৎ খুশি হবে, আর সেই খুশিকে জড়িয়ে লতার মতো বেড়ে উঠবে কন্যার সুখ-শান্তি। মেয়েটার ভাগ্য, জামাতার তাই সুমতি হয়েছে। এখন মেয়ে বুঝে-সুঝে চলতে পারলেই—

'শাখা! এখনো ব'সে আছিস! যা—স্নান-টান—' বলতে-বলতে বারান্দায় এসে গুপ্ত অবাক। কোথায় শাখা, অসীমই বা কোথায়। গুপ্ত এদিকে তাকালেন, ওদিকে তাকালেন, একবার রেলিঙে ভর দিয়ে রাস্তা দেখলেন, একবার দরজার কাছে

এসে সিঁড়িটা দেখলেন—পা বাড়ালেন যাবেন ব'লে, কিন্তু পা চললো না, পা অবশ হ'লো, একটা খালি বস্তাকে দাঁড় করাতে গেলে যেমন হয়, তেমনি ক'রে তিনি নেতিয়ে পড়লেন একটা চেয়ারে—তাঁর লম্বা-চওড়া সুপুষ্ট দেহ কুঁকড়ে যেন এইটুকু হ'য়ে গেলো।